গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬১ বর্ষ ৯ সংখ্যা ২৬ সেপ্টেম্বর - ২ অক্টোবর, ২০০৮ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

চুক্তি ভঙ্গকারী এই সরকারের কোনও বিশ্বাসযোগ্যতাই নেই

সিঙ্গুরে ২৪ আগস্ট অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরতের দাবিতে লাগাতার ধরনা শুরু হওয়ার সময়ে সিপিএম নেতাদের আশা ছিল, এই কর্মসূচি অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়বে। পরিবর্তে প্রতিদিন যখন বেশি বেশি সংখ্যায় মানুষ ধরনার সমর্থনে সামিল হতে লাগল, তখন সরকার এবং সিপিএমের পক্ষ থেকে নানা রকম মিথ্যা প্রচার করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চলতে লাগল। একদিকে প্রচার করা হল, বিরোধীরা কোনও আলোচনাতেই রাজি নয়, তাই সরকার ইচ্ছা থাকলেও সমস্যা সমাধানে কিছু করতে পারছে না। অপরদিকে প্রচার তুলল, ধরনার জন্য দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ে বনধ হয়ে থাকায় মাল পরিবাহী ট্রাকগুলি আটকে রয়েছে, ফল-শাকসব্জি-ডিম-ওষুধ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তেমনই বাজারে যোগানের অভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। আন্দোলনকে হেয় করতে সংবাদমাধ্যমের একাংশও সিপিএম নেতাদের এই বক্তব্য ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকল। কিন্তু এতেও কাজ হল না। অচিরেই ফাঁস হয়ে গেল যে, অন্য রাস্তা দিয়ে গাড়ি না ঘুরিয়ে দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিকল্পনা করেই পুলিশের সাহায্য নিয়ে এক্সপ্রেস ওয়েতে যানজট করানো হয়েছে। তাছাড়া বছরের পর বছর ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও যে সিপিএম নেতারা রা কাড়েননি, আজ মূল্যবৃদ্ধির কথা বলে তাঁদেরই হঠাৎ এত উদ্বেগের উদ্দেশ্য বুঝতে কারও অসুবিধা হয়নি। এই সময়ে রাজ্যপাল সমস্যার মীমাংসার জন্য কোনও মধ্যস্থতাকারীর সাহায্য নিতে অনুরোধ করে মমতা ব্যানার্জীকে চিঠি দিলেন, তার কপি মুখ্যমন্ত্রীকেও পাঠালেন। বিরোধীপক্ষের অনুরোধ সত্ত্বেও রাজ্যপাল নিজে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিতে রাজি হননি। এরপর সরকারের তরফে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী একই অনুরোধ করায় রাজ্যপাল দু'পক্ষের মীমাংসা বৈঠকে সভাপতিত্ব করতে রাজি হন। ৭ সেপ্টেম্বর রাজ্যপালের উপস্থিতিতে সরকার পক্ষ এবং বিরোধীপক্ষ এক সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করল এবং সরকারের এই সিদ্ধান্তকে মুখ্যমন্ত্রী শিল্পায়ন ও উন্নয়ন নীতির জয় বলে ঘোষণা করলেন। রাজ্যের এক অংশের মানুষ, যাঁদের সিপিএম নানা মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত করেছিল, তাঁরাও অন্যদের সাথে এই চুক্তিকে স্বাগত জানালেন।

চুক্তি মানার দাবিতে ১৬ সেপ্টেম্বর সিঙ্গুরের সভায় বক্তব্য রাখছেন মমতা ব্যানার্জী। এস ইউ সি আই নেতা কমরেড সৌমেন বসু (বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়) এই সভায় বক্তব্য রাখেন।

কিন্তু তখনও নাটকের বাকি ছিল। মঞ্চে আবির্ভূত হলেন টাটা স্বয়ং। বললেন, প্রকল্পের এক ইঞ্চি জমি বাদ গেলেও তাঁরা প্রকল্প তুলে নিয়ে যাবেন। ব্যস, আর যায় কোথা! রাত না পোহাতেই ডিগবাজি খেলেন শিল্পমন্ত্রী, এবং তাই দেখে মুখ্যমন্ত্রীও। সংবাদমাধ্যমের সামনে দুই মন্ত্রীকে পাশে নিয়ে রাজ্যপালের পাঠ করা চুক্তির যে বয়ান দেশের কোটি কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ করলেন, তা একেবারে নাকচ করে দিলেন তাঁরা। তাঁদের কণ্ঠে শোনা গেল টাটার কথারই প্রতিধ্বনি। মার্কসবাদ জিন্দাবাদ বলতে বলতেই তাঁরা টাটার স্বার্থরক্ষার কত বড় নির্লজ্জ এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে, তা তাঁদের কথায়, আচরণে একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেল। তাঁরা বললেন, চুক্তিতে অনিচ্ছুক চাষিদের প্রকল্পের ভেতরেই বেশিরভাগ জমি দেওয়ার যে কথা লেখা আছে, তার প্রকৃত অর্থ আসলে 'যতদূর সম্ভব

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিহারে বন্যার্ত এলাকায় ত্রাণকাজে এস ইউ সি আই এবং এম এস সি

বিহারের বন্যাপ্লাবিত জেলাগুলির মানুষ অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে রয়েছেন। বিধ্বস্ত মাধেপুরা জেলার মুরলিগঞ্জ ও বিহারীগঞ্জে এস ইউ সি আই কর্মীরা রিলিফ ওয়ার্ক করছেন। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের কেন্দ্রীয় কমিটি মেডিকেল রিলিফের কাজ শুরু করেছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ডাঃ তরুণ মণ্ডল এবং কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য ডাঃ সুজিত চৌধুরীর নেতৃত্বে ৬ জন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী সহ মোট ১২জনের একটি টিম সুপৌল এবং মাধেপুরা জেলার বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করে প্রায় ৩ হাজারের বেশি রোগীর চিকিৎসা করেন এবং বিনামূল্যে ওষুধ দেন। উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি হল, সুপৌল জেলার ত্রিবেণীগঞ্জ ব্লকের ঔরলাহা, ছলাস, থারবিটিয়া নরহি মধ্য বিদ্যালয়, কিষাণপুর মহাবিদ্যালয়, ইটুয়া এবং সূর্যাপুরের অন্তর্গত রাধানগর।

ডাঃ তরুণ মণ্ডল জানান, উপরোক্ত জায়গাগুলির মধ্যে বেশিরভাগই খুব প্রত্যন্ত স্থান, বন্যাবিধ্বস্ত এইসব এলাকায় মানুষ অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে অথচ সরকারের তরফ থেকে কোনও সাহায্যই প্রায় পৌঁছয়নি। সেখানে অধিকাংশ মানুষ পেটের নানা অসুখে ভুগছেন। এছাড়াও শ্বাসযন্ত্রের পীড়া, চর্মরোগ, কানের ইনফেকশন এবং চোট-আঘাতের সমস্যাও আছে। তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যে দিল্লি, ঝাড়খণ্ড এবং বিহারের অন্যান্য জায়গা থেকে সংগঠনের ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা বন্যাদুর্গত এলাকায় পৌঁছেছেন। এখন দিল্লি ইউনিটের ডাঃ প্রসাদের নেতৃত্বে মেডিকেল টিম চিকিৎসা ক্যাম্প চালাচ্ছে এবং আগামী একমাস এই ক্যাম্প চালানো হবে। ডাঃ মণ্ডল জানান, মাধেপুরা জেলার মুরলিগঞ্জে এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে বন্যার্তদের জন্য রান্না করা খাবার এবং বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে, যা দেখে তাঁদের টিমের সদস্যরা খুবই উৎসাহিত হয়েছেন।

ডাঃ মণ্ডল এবং ডাঃ চৌধুরী ছাড়াও তাঁদের টিমে ছিলেন ডাঃ গৌতম নস্কর, ভক্তিপদ সিংহ, সোমনাথ নস্কর, দীপঙ্কর মেটিয়া এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্য ইউনিটের পক্ষ থেকে ডাঃ গোপাল মাহাত ও নরেশ মাহাত। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়া এক প্রেস বিবৃতিতে জানান, বন্যাদুর্গত অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে ত্রাণ এবং চিকিৎসা সাহায্য পৌঁছনোর জন্য বিহার সরকার কোনও পদক্ষেপই প্রায় নিচ্ছে না। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যারা সেখানে বন্যাবিধ্বস্ত মানুষদের সাহায্য করতে চায়, তাদের সেইসব প্রত্যন্ত এবং যোগাযোগবিহীন এলাকায় যাতায়াতের ব্যবস্থা সরকার থেকে করা উচিত। সাথে সাথে ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়া দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান, এই ক্যাম্প চালানোর জন্য সকলে যেন সাধ্যমত ওষুধপত্র ও অর্থ সাহায্য করেন।

সুপৌল জেলার রাধেপুরায় এস ইউ সি আই পরিচালিত একটি ত্রাণশিবির

চিকিৎসা শিবিরে ডাঃ তরুণ মণ্ডল

এ আই এম এস এস-এর ৫ম মুর্শিদাবাদ জেলা মহিলা সম্মেলন

২১ আগস্ট বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত হল এ আই এম এস এস-এর মুর্শিদাবাদ জেলার ৫ম মহিলা সম্মেলন। নারীপাচার, বধূহত্যা, নারী নির্যাতন, যৌনশিক্ষা প্রতিরোধ সহ নারী জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৬০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন এবং শহিদ বেদিতে মাল্যদানের পর প্রতিনিধি অধিবেশন শুরু হয়। দেশে-বিদেশে গণআন্দোলনে নিহত শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব এবং দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি সহ নারীজীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে উত্থাপিত প্রস্তাবের সমর্থনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড় অন্যান্য মহিলা সংগঠনের সাথে এ আই এম এস এস-এর পার্থক্য কোথায় তা দেখিয়ে নারীমুক্তি আন্দোলনের জন্য সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধির আহ্বান জানান। সংগঠনের সর্বভারতীয় সহসম্পাদিকা কমরেড মেনকা বসুরায় বলেন, আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে নারী পাচার বা বধূ নির্যাতনের মতো মর্মান্তিক ঘটনাই না ঘটে। উল্লেখ্য, সীমান্তবর্তী জেলা হিসেবে মুর্শিদাবাদ জেলা নারীপাচারে শীর্ষস্থানীয়। স্থানীয় গার্লস কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা সন্ধিনী রায়চৌধুরী নারী সমস্যা সমাধানে এম এস এস-এর আন্দোলনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করেন। প্রধান বক্তা সংগঠনের সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী বলেন, নারীজীবনের মূল সমস্যাগুলির জন্য পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদই দায়ী। প্রকৃত নারীমুক্তির জন্য চাই সমাজ বিপ্লব, এর জন্য তিনি সমাজের সর্বস্তরের মহিলাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কমরেড দিলখুসা বেগমকে জেলা সভানেত্রী ও কমরেড পূর্ণিমা কর্মকারকে সম্পাদিকা করে জেলা কমিটি ও জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

মুর্শিদাবাদে নির্যাতিতা নারীদের কনভেনশন

১৮ সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় মিতালি সিনেমা হলে 'রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি'র উদ্যোগে নির্যাতিতা নারীদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ঝোড়ো বাতাস ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে রমজান মাসের অসুবিধা সত্ত্বেও প্রায় সাত শত নির্যাতিতা নারী প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কনভেনশনে উপস্থিত হন। তালাকপ্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যক্তা, অল্প বয়সে বিধবা, ধর্ষিতা, পাচার হওয়া, পণের কারণে অত্যাচারিতা অসহায় নারীরা এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। মুর্শিদাবাদ জেলা নারী পাচারে ভারতবর্ষের মধ্যে শীর্ষস্থানে। এই কারণে ২০০৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এ কে সাবরওয়াল মুর্শিদাবাদে সরেজমিন তদন্তে আসনে। মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় শুধু তালাকপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যাই প্রায় এক লক্ষ। এছাড়া স্বামী পরিত্যক্তা ও অন্যান্যভাবে নির্যাতিত উপার্জনহীন কয়েক লক্ষ অসহায় নারী এখানে বাস করেন। পুরুষশাসিত সমাজে, পুরুষের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে স্বামীর গৃহে জায়গা না হলে এই সমস্ত মা-বোনেরা হয়ে পড়েন আশ্রয়হীন, উপার্জনহীন, অসহায়। কার্যত তাঁরা ভিখারির মতো জীবনযাপনে বাধ্য হন। চরম দারিদ্র ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে পাচারকারীরা এঁদের কাজ দেওয়ার নামে প্রলুব্ধ করে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়।

আত্মমর্যাদা ও সম্মান নিয়ে বাঁচতে গেলে নারীদের চাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, অন্নের গ্যারান্টি, চাই স্বনির্ভরতা। এই পথে নারীপাচার অনেকটাই বন্ধ করা যায়। এই লক্ষ্যে রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি অসহায় ও নির্যাতিতা নারীদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছে।

এদিনের কনভেনশনে তালাকপ্রাপ্ত তাহেরা বিবি বলেন, 'মেয়ের বিয়ে দেবার পণের টাকা আমার স্বামী আমার বাপের বাড়ি থেকে আনতে বলে। আমি তা পারিনি। তাই আমার ৪২ বছর বয়সে স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছে।' স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের মধ্যে নুরেজান বিবি, সাহেদা বেওয়া, পূর্ণিমা বেওয়া, আলেয়া খাতুন, জেরেজাবা বিবি, রুবিয়া বিবি, নূরনাহার বিবি, নূরবানু বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বিধবা, ধর্ষিতা ও পাচার হওয়া কয়েকজন নারীও তাদের জীবনযন্ত্রণার কথা তুলে ধরেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী জয়নাল আবেদিন অসহায় নারীদের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে মহীয়সী নারী রোকেয়া সাখাওয়াতের জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন ও নির্যাতিতা নারীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কনভেনশনের প্রধান বক্তা রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির জেলা সভাপতি খাদিজা বানু অসহায় নির্যাতিতা মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, এজন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে হবে এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, দরিদ্র মহিলাদের বিপিএল কার্ড, রেশন কার্ড, ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি পাওয়ার জন্য লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আর চাই শিক্ষা, যার মধ্য দিয়ে সচেতনতা বাড়বে। হলভর্তি অসহায় নির্যাতিতা নারীরা এই বক্তব্যকে হাত তুলে সমর্থন জানিয়ে আন্দোলনে থাকার অঙ্গীকার করেন। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন মুক্তা বেগম। কনভেনশন থেকে ১৫ জনকে নিয়ে সমিতির বেলডাঙা-১ ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন

এস এফ আই-এর ন্যক্কারজনক আক্রমণের প্রতিবাদ জানাল ডি এস ও

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার রামপুর, রামনগর, পালপাড়া, ঘাটাল ও পিংলা কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এস এফ আই এবং সি পি এম-এর ন্যক্কারজনক আক্রমণের প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই ১৬ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, এস এফ আই এবং সিপিএম মুখে যতই গণতন্ত্রের কথা বলুক কলেজে কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই তাদের ফ্যাসিস্ট চরিত্র গোটা রাজ্য প্রত্যক্ষ করছে। হলদিয়ার রামপুর বিবেকানন্দ মিশন কলেজে ডিএসও এবং টিএমসিপি জোটের ছাত্র সংহতি মঞ্চের ৩০ জন ছাত্রছাত্রী ১৫ সেপ্টেম্বর নমিনেশান পেপার তুলতে গেলে এসএফআই এবং বহিরাগত গুণ্ডারা প্রিন্সিপাল-এর ঘরের সামনেই তাদের রড, লাঠি ও উইকেটের স্ট্যাম্প দিয়ে ব্যাপক মারধর করে, ছাত্রীদের জামা ছিঁড়ে দেয়, অশালীন ব্যবহার করে। এই ঘটনা ছাত্রছাত্রীরা প্রিন্সিপালকে জানাতে গেলে প্রিন্সিপাল তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে এসএফআই-এর সাথে বেরিয়ে যান। এমতাবস্থায় মঞ্চের অন্যান্য ছাত্র এবং অভিভাবকরা ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে কলেজ গেটে অবস্থান করলে এসএফআই গুণ্ডারা তাদের উপর ইট বর্ষণ করে এবং বহিরাগত সিপিএম-এর বিশাল হার্মাদ বাহিনী তাদের উপর আক্রমণ চালায়। এর প্রতিবাদে ছাত্র-অভিভাবকরা পথ অবরোধ করলে এসডিও-ডিএসপিও'র নেতৃত্বে বিরাট পুলিশ বাহিনী এসে মঞ্চের ছাত্রছাত্রীদের কলেজ থেকে উদ্ধার করে। এ ঘটনায় মঞ্চের ৯ জন গুরুতর আহত হয়। তাদের মহিষাদল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পরদিন আবার ছাত্রছাত্রীরা নমিনেশান পেপার তুলতে গেলে প্রায় ২ হাজার হার্মাদ যারা আগে থেকে কলেজ ঘিরে রেখেছিল তারা ছাত্রছাত্রীদের উপর আক্রমণ চালায়। বাঁচার তাগিদে ছাত্ররা স্থানীয় এক শিক্ষকের বাড়িতে আশ্রয় নিলে হার্মাদ বাহিনী ঐ বাড়ি ঘিরে ফেলে — সেখানে কয়েকটি মোটল সাইকেল ও সাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং বাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় এসডিও-ডিএসপিও'র নেতৃত্বে বিশাল র‍্যাফ বাহিনী হার্মাদদের হটিয়ে বাড়িটি রক্ষা করে এবং ছাত্রছাত্রীদের উদ্ধার করে।

একইভাবে তারা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর কলেজে এসএফআই বিরোধী জোটের ১২ জনকে, পালপাড়া কলেজে ১০ জনকে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল কলেজের ৬ জনকে এবং পিংলা কলেজে ৫ জনকে গুরুতর আহত করে। বেশিরভাগ ছাত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তিনি বলেন, সামান্য কলেজ নির্বাচনে বিরোধী ছাত্রদের নমিনেশান পেপার তুলতে না দিয়ে নন্দীগ্রামের মত সম্পূর্ণ ফ্যাসিস্ট কায়দায় এসএফআই ও সিপিএম ছাত্র সংসদ দখল রাখতে চাইছে— এটা কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নয় গোটা সমাজের সামনেই ভয়ঙ্কর বিপদ হিসাবে দেখা দিচ্ছে।

তিনি বলেন, এই ঘটনার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। আমরা অবিলম্বে দোষী এসএফআই ও সিপিএম নেতাদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি এবং কলেজে কলেজে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সহ সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে সোচ্চার হয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সমাজকে রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

এই বর্বর হামলার প্রতিবাদে ডি এস ও ১৮ সেপ্টেম্বর পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে 'ধিক্কার দিবস' পালন করে।

'আমার মৃত্যুর জন্য রাজ্য সরকারই দায়ী'

অভিযোগ জানিয়ে আত্মহত্যা পি টি টি আই ছাত্রের

সোনারপুরের সোনারগাঁও পি টি টি আই কলেজের ২০০৫-০৬ সালের ছাত্র, ক্যানিং-এর অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান অনন্ত মণ্ডল গত ২৬ আগস্ট আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর আগে লেখা চিঠিতে দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে চলা পি টি টি আই সমস্যার সমাধান না হওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে তিনি সরাসরি দায়ী করেছেন। এর আগেও আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন আর এক পি টি টি আই ছাত্র অভিজিৎ নন্দী। পি টি টি আই সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য মন্ত্রীরা বহু সময়ে বহু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। অথচ দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলেও সমাধানের কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। ফলে পি টি টি আই ছাত্ররা আজ চূড়ান্ত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে। জমি বিক্রি করে, বাড়ি বন্ধক রেখে প্রশিক্ষণ নেওয়া দরিদ্র ঘরের এই সমস্ত ভাবী শিক্ষকরা দুঃসহ অনিশ্চয়তার ভার বহু ক্ষেত্রে বইতে পারছেন না। ফলে একের পর এক আত্মহত্যার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে চলেছে। এদিকে উদাসীন সরকার প্রাথমিক স্কুলে পি টি টি আই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রদের নিয়োগ না করে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়োগ করছে। এর প্রতিবাদে ৫ সেপ্টেম্বর পথে নামলেন পি টি টি আই ছাত্ররা। পথ অবরোধের মধ্য দিয়ে শিক্ষক দিবস পালন করলেন তাঁরা। হাজার হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভাবী শিক্ষক জেলায় জেলায় এই বিক্ষোভে সামিল হন। ১২ সেপ্টেম্বর বিকাশ ভবন ঘেরাওয়ের ডাক দেওয়া হয়। সরকারের নিষ্ঠুরতা যাতে তাঁদের আর কোনও সতীর্থের প্রাণ কেড়ে নিতে না পারে সেজন্য নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরের লড়াকু মানুষের মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে লড়াইয়ে নেমেছেন পি টি টি আই ছাত্ররা।

পুরুলিয়ায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভঃ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়) এবং যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের কনফেডারেশন অফ স্টেট গভঃ এমপ্লয়িজ ফেডারেশন (আই এন টি ইউ সি)-এর যৌথ উদ্যোগে ১১ সেপ্টেম্বর পুরুলিয়া শহরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালিত হয়। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ৯ দফা দাবি নিয়ে বক্তব্য রাখেন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক কমরেড হরলাল মাহাত সহ জেলা নেতৃবৃন্দ এবং কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সুখেন্দু শেখর ত্রিপাঠী। এছাড়াও দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সংগ্রামী রেল শ্রমিক আন্দোলনের নেতা কমরেড মিহির কুমার সিনহা। দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পুরুলিয়া জেলা শাসকের নিকট প্রদান করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড উদয়শঙ্কর চক্রবর্তী।

টাটা ঃ কর্ণাটকেও এস ইউ সি আইয়ের নেতৃত্বে চাষিরা আন্দোলনে

এবার টাটাদের হুমকি, তারা নাকি চলে যাবে কর্ণাটকের ধারওয়ারে। টাটা মোটরসের এম ডি রবিকান্ত এবং কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদিউরাপ্পা আলোচনা করে এই কথা জানিয়েছেন। কিন্তু সেই ধারওয়ারে টাটাদের নিয়ে রয়েছে বহু অসন্তোষ। সব থেকে বড় কথা, টাটারা এই ধারওয়ার প্রকল্প নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু কোনও কথাই রাখা হয়নি বলে অভিযোগ। আবার সিঙ্গুর আর ধারওয়ারের মধ্যে কোনওরকম তুলনাই হয় না। সিঙ্গুরের জমি উর্বর। সারা বছর চাষ হয়। এই চারফসলি জমির সঙ্গে ধারওয়ারের কালো মাটির জমির তুলনাই হয় না।

কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরু থেকে ধারওয়ারের দূরত্ব ৪২৫ কিমি। এই এলাকায় টাটারা ২০ বছর আগে জমি নেয় রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। ১৯৮৮ সালে সেই জমি তখনকার কংগ্রেস সরকার জোর করেই অধিগ্রহণ করেছিল। সেই সময়ে গাড়ির কারখানা করবে বলেই টাটারা ওই ৬৪৭ একর জমি নিয়েছিল। সেই জমির ক্ষতিপূরণ বহু কৃষক এখনও পাননি বলে অভিযোগ। তখন বলা হয়, জমিহারা পরিবারপিছু একজন করে কাজ পাবেন কারখানায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজ পান মাত্র ২৫০ জন। তাও সকলেই বহিরাগত। এই বিষয়টি নিয়ে কর্ণাটকের এস ইউ সি আই আন্দোলন করে। বেঙ্গালুরু থেকে এস ইউ সি আই নেতা কে রাধাকৃষ্ণ জানালেন, ''এখনও এখানকার ১৪ থেকে ১৫টি গ্রামের মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছেন। এর ওপর নতুন করে জমি দেওয়ার কথায় সেই ক্ষোভ গতকাল থেকে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।''

এস ইউ সি আই-র স্থানীয় নেতা রামানজানাপ্পা আলাদাল্লি এই টাটাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আন্দোলন চালাচ্ছেন। তিনি ধারওয়ার থেকে জানালেন, ''জমি অধিগ্রহণের সময়ে মাত্র ১২ হাজার টাকা একর পিছু দেওয়া হয়। বলা হয়েছিল, পরিবারের একজন চাকরি পাবে। এই টাকাতেই রাজি হয়ে যান গ্রামবাসীরা। কিন্তু সেই চাকরি আর হয়নি। এখন ফের জমি যাওয়ার চিন্তায় নতুন করে আন্দোলন শুরু হচ্ছে এখানে। আপনাদের রাজ্যই (পশ্চিমবঙ্গ) আমাদের কাছে আদর্শ।'' কর্ণাটক সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক এদিন ছিলেন দক্ষিণের শহর মাঙ্গালুরুতে। সিপিএম নেতা জি এন নাগরাজ বললেন, ''ওই এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ, কারণ বিশাল পরিমাণ জমি নিয়ে কার্যত ফেলে রেখেছে টাটারা। পাঁচ ভাগের এক ভাগ কাজে লাগিয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, প্রয়োজনেই যদি না লাগে, তবে এত জমি কেন নেওয়া হয়েছিল?'' সেই জমি কার্যত ফেলে রেখেই টাটারা ২০০৭ সালে ফের আরও ৩০০ একর জমির আব্দার করে রাজ্য সরকারের কাছে। এই নিয়ে সেই সময়ে ওই এলাকায় ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল কর্ণাটক দলিত সংঘর্ষ সমিতি। সমিতির সভাপতি লক্ষ্মীনারায়ণ নাগওয়ার ধারওয়ার থেকে জানালেন, ''টাটা এবং রাজ্য সরকার মিলিতভাবে স্থানীয় মানুষকে ঠকিয়েছে। আমরা সেই সময়ে ফের অতিরিক্ত ৩০০ একর জমি দেওয়ার বিরোধিতা করেছিলাম। কিন্তু সেই সময়ে রাজ্য সরকার সেই জমিও দিয়ে দেয়। এই এলাকায় বাংলার মতন সংগঠিত আন্দোলন নেই বলেই চলে জোর জবরদস্তি।'' ধারওয়ারে বামপন্থীদের সংগঠন তেমন নেই। সিপিএমের কয়েকজন সমর্থক মাত্র রয়েছেন বলে জানালেন নাগরাজ। তবে যমজ শহর হুবলিতে সংগঠনের শক্তি ভালো। ধারওয়ারে জমির আন্দোলনে নেমেছিল এস ইউ সি আই।

ধারওয়ারে জমি অধিগ্রহণের সময়ে বলা হয়েছিল টাটাদের প্রকল্পে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে কাজ মিলবে ৩৭ হাজার মানুষের। বলা হয়েছিল, হবে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট। হয়েছিল অ্যাসেম্বলি ইউনিট। পরে ফের ৩০০ একর জমি অধিগ্রহণের সময়ে বলা হয় নতুন করে কাজ পাবেন ১০ হাজার সরাসরি এবং ২০ হাজার মানুষ কাজ পাবেন পরোক্ষে। আবার পরে রাজ্য সরকার এবং টাটারা মিলিতভাবে জানায় কাজ পাবেন ৩৬ হাজার ৬৭৫ জন। ১৯৯৯ সালে প্রথমে টেলকন গঠিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে জামশেদপুরের পর ধারওয়ারে ইউনিট চালু হয়। পরে এই এলাকাতেই ব্রাজিলের মার্কোপোলো এস এ সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বাস তৈরির কাজ শুরু করার কথা হয়। সেই বাস এখনও বের হয়নি।''

(দৈনিক স্টেটসম্যান, ২০ সেপ্টেম্বর শঙ্কর ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন থেকে)

সিপিএমের নজরে এবার কাটোয়ার উর্বর জমি

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মতোই প্রস্তাবিত বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে কাটোয়ার পরিস্থিতি গরম হয়ে উঠছে। উর্বর তিনফসলি জমি হারানোর আশঙ্কায় গ্রামবাসীরা গড়ে তুলছেন আন্দোলন। আবার সরকারি দল দুষছে বিরোধীপক্ষকে; তবে কি বিদ্যুৎও চাও না? বিদ্যুৎগ্রাহকদের নিয়ে যারা আন্দোলন গড়ে তুলছে সেই অ্যাবেকা বলছে, লোডশেডিং বন্ধ করতে হবে। সরকারপক্ষ বলছে, লোডশেডিং বন্ধ করতে হলে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে। নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র চাই। তাই কাটোয়া চাই। (কেন না কাটোয়ার বিধায়ক কংগ্রেসের, যেমন সিঙ্গুরের বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের)।

এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ পড়েছে উভয়সংকটে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে না হয় ব্যক্তিমালিকের কারখানার প্রশ্ন, কিন্তু কাটোয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র তো কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়! সকলের জন্যই বিদ্যুৎ প্রয়োজন, তাই বিদ্যুৎকেন্দ্র। সেজন্য সঠিক তথ্য জানা না থাকলে পক্ষ নেওয়াটা কঠিন। মনে হতে পারে বিদ্যুৎ যদি সত্যিই প্রয়োজন হয়, তবে কাটোয়ার কৃষকদের জমি ছেড়ে দেওয়া উচিত — দেশের এবং দশের স্বার্থে।

মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে বিদ্যুৎ যে প্রয়োজন তা কেউই অস্বীকার করবে না। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, যে পরিমাণ বিদ্যুৎ আমাদের দেশে অপচয় হয়, তা যদি কমানো যেত তবে নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন হতো না। অপচয় যে হয় এবং এদেশে তা যে বিশ্বের গড়পড়তা মানের চেয়ে অনেক বেশি তা ঠিক। কিন্তু এদেশে এখনও যত মানুষ বিদ্যুৎ পান না, যে সমস্ত ছেলেমেয়ে এখনও মোমবাতি-হ্যারিকেনের আলোয় পড়ে, তাদের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে গেলে আরও বিদ্যুৎ যে প্রয়োজন তা অস্বীকার করা যায় না।

বিদ্যুতের উৎস বলতে তাপবিদ্যুৎ আর জলবিদ্যুৎ। বিকল্প উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব ঠিকই, কিন্তু এখনও তা খরচসাপেক্ষ। হাওয়াকলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা হচ্ছে মেদিনীপুরের সমুদ্র উপকূলে। কিন্তু সেখানে হাওয়ার গতিবেগ তামিলনাড়ু বা গুজরাতের চেয়ে অনেক কম। তাই তাপবিদ্যুৎ বা জলবিদ্যুতের জায়গা নেওয়া সম্ভব নয় হাওয়াবিদ্যুতের পক্ষে, অন্তত এই রাজ্যে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কিছু সুযোগ উত্তরবঙ্গে থাকলেও দক্ষিণবঙ্গে নেই। তাই দক্ষিণবঙ্গকে তাপবিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল থাকতেই হবে।

তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজন হয় মূলত দুটি জিনিস — কয়লা ও জল। কয়লা লাগে জ্বালানি হিসেবে। তাকে বাদ দেওয়ার উপায় নেই। কয়লা গুঁড়ো করে জ্বালিয়ে যে তাপ উৎপন্ন হয় তা দিয়ে জলকে বাষ্পীভূত করা হয়। উৎপন্ন হয় উচ্চতাপের বাষ্প, যা টারবাইন ঘোরায়। তাপশক্তি পরিবর্তিত হয় যান্ত্রিক শক্তিতে এবং তা থেকে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তিতে। টারবাইন থেকে যে বাষ্প বেরিয়ে আসে তাকে আবার ঠাণ্ডা করে জলে রূপান্তরিত করতে হয়। সেই জল আবার ফেরত যায় বয়লারে। এই যে জল বয়লার আর টারবাইনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে চলে তার পরিমাণ কিন্তু এমন কিছু বেশি নয়। তাহলে জল লাগে কোথায়? লাগে মূলত টারবাইন থেকে বেরিয়ে আসা বাষ্পকে ঠাণ্ডা করতে। কোলাঘাট কিংবা ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে নদীর জল টেনে নিয়ে কুলিং টাওয়ারের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু নদীই বা প্রয়োজন কেন? বড়োসড়ো সরোবর বা জলাশয় দিয়ে চলবে না কেন? ওপরে বলা পদ্ধতিটি যদি অনুধাবন করেন তাহলে দেখবেন, জলের জোগান ততটাই প্রয়োজন যতটা কুলিং টাওয়ারের মধ্যে বাষ্পীভূত হয়ে হাওয়ায় মিশে যায়। সারা বছরে সেই পরিমাণ জলের জোগান যদি নিশ্চিত করা যায়, তবে বয়লার দিয়েই কাজ চলতে পারে।

যেহেতু, তাপবিদ্যুতের জন্য কয়লা আর জল প্রয়োজন, তাই তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র কোথায় করা হবে সে ব্যাপারে দুই ধরনের জায়গা অগ্রাধিকার পায়। এক, নদীর ধার; দুই, কয়লাখনির কাছে। প্রথম ক্ষেত্রে কয়লাখনি দূরে থাকায় কয়লা নিয়ে আসতে হয় মালগাড়ি করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জলের উৎস দূরে থাকায় খাল কেটে জল আনতে হয় অথবা জলাশয় খনন করে নিতে হয়।

প্রশ্ন হল, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কোনটা বাঞ্ছনীয়? সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুবিধের জন্য আরও দু-একটা তথ্য দিই। ভারতে যে কয়লা পাওয়া যায় তার পঞ্চাশ শতাংশই ছাই। তাই ওয়াগন করে যখন ঝরিয়া-রানিগঞ্জ থেকে কোলাঘাটে কয়লা আনা হয় তখন বাস্তবে অর্ধেক ট্রেন বোঝাই করা ছাই আনা হয়। এই ছাই বিদ্যুৎকেন্দ্রের চারপাশে জমতে থাকে, দূষণ ঘটায়। সরিয়ে ফেলতে না পারলে বিদ্যুৎকেন্দ্র চালানোই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ছাই নদীর জলে গিয়ে পড়লে নদী দূষিত হয়। নাব্যতা বিঘ্নিত হয়।

যদি কয়লাখনির কাছাকাছি অঞ্চলে বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করা হয়, তাহলে অনেকগুলি সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়। রেলগাড়ি করে লম্বা দূরত্বে কয়লা (এবং ছাই) বয়ে আনতে হয় না। ছাইকে কাছাকাছি কোনও পরিত্যক্ত কয়লাখনিতেই ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। নদীর ধারের অতি উর্বর জমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। কয়লাখনি অঞ্চলের পতিত জমি ব্যবহার করেই কাজ চলে যায়। শুধু একটু খরচ করে একটি বড় জলাশয় তৈরি করতে হয়, অথবা কোনও জলাধার থেকে খাল কেটে জল আনার ব্যবস্থা করতে হয়।

এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের যা ইতিহাস — ব্যাণ্ডেল, কোলাঘাট, বজবজ, ফারাক্কা — সবই নদীর ধারে। মনে হয় পরিকল্পনাকাররা জলের প্রয়োজনটাই বড় করে দেখেছেন, গাড়ি ভর্তি ছাই বয়ে নিয়ে যাওয়ার অপচয়টা দেখতে পাননি। বহু দেশেই যে 'পিটহেড পাওয়ার প্ল্যান্ট' অগ্রাধিকার পায় সে খবর রাখেননি। আর এদেশে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে — গরিব মানুষের জীবন সস্তা হওয়ায় এই সব প্রজেক্টের 'হিউম্যান কস্ট'টা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি। কাটোয়ার আন্দোলন যদি তাঁদের অন্যভাবে ভাবতে বাধ্য করে তবে সকলেরই মঙ্গল।

(দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় ১১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত, খড়্গপুর আই আই টি-র অধ্যাপক সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ।)

চাষের জমি ছাড়তে নারাজ কাটোয়ার চাষিরা

কৃষিজমি ধ্বংস করে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে কাটোয়ার প্রস্তাবিত এলাকার হাজার হাজার মানুষ ১৫ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভ দেখাল এসডিও দপ্তরে। 'কৃষিজমি, কৃষক ও খেতমজুর বাঁচাও কমিটি'র নেতৃত্বে ধারাবাহিকভাবে এই আন্দোলন চলছে। গত আগস্ট মাসে ৩৫০ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য ৪০৩ জন চাষিকে শুনানিতে ডাকা হয়। প্রথম দু'দিনে ২০৭ জন চাষি তাদের অসম্মতি জানালে বাকি শুনানি স্থগিত রেখে বিদ্যুৎমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে চাষিরা অনিচ্ছুক হলে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কাটোয়ায় হবে না। কিন্তু আবার ২৭ আগস্ট এস ইউ সি আই ও তৃণমূল কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সর্বদলীয় সভা করে প্যাকেজ ঘোষণা করা হয় ও তার ভিত্তিতে নতুন করে শুনানির দিন ধার্য হয়। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই-তৃণমূল জোট ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

পূর্বেই ৪০৩ জন চাষি জেলাশাসক দপ্তরে ও ২০৭ জন চাষি শুনানিতে জমি দিতে অনিচ্ছুক জানিয়ে আসার পরও পুনরায় শুনানির আয়োজন করার বিরুদ্ধে কমিটির পক্ষ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি নেওয়া হয়। ঐদিন প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে কোশিগ্রাম, দেবকুণ্ডু, কদমপুকুর, বাউরা, নহাটা, বাননাগরা, বুঁইচি প্রভৃতি গ্রাম থেকে দুই সহস্রাধিক মানুষ মিছিলে পা মেলান। ছাত্রছাত্রী ও মা-বোনেদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। মুষলধারায় বৃষ্টির মধ্যে প্রতিবাদী মানুষের এই দৃপ্ত মিছিল কাটোয়ার মানুষ বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছে।

ডেপুটেশনের আগে কোর্ট চত্বরে এক সংক্ষিপ্ত সভায় কোনও প্যাকেজের বিনিময়েই জমি দিতে কৃষকরা রাজি নয় — এ কথাই বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করা হয়। জোর করে জমি অধিগ্রহণের চেষ্টা করা হলে রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে বলেও প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। সভায় তপন ঘোষ, অশোক চৌধুরী এবং কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা ও এস ইউ সি আই কাটোয়া লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড ব্রহ্মপদ ব্যানার্জী বক্তব্য রাখেন। কমরেড ব্যানার্জী তাঁর বক্তব্যে প্রস্তাবিত এলাকার সমস্ত চাষিকেই অবিলম্বে জমি দিতে অনিচ্ছুক জানিয়ে কোর্টে হলফনামা দেওয়া এবং গ্রামে গ্রামে গণকমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান।

এ আই ডি এস ও-র
মাথাভাঙা কলেজ ইউনিট সম্মেলন

এআইডিএসও মাথাভাঙা কলেজ ইউনিট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ৩ সেপ্টেম্বর স্থানীয় ঝংকার ক্লাবে। মোট ১০৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড মৃণাল কান্তি রায়। উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যাপক রঞ্জিৎ নন্দী। মূল বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন রাজ্য সহসভাপতি কমরেড নেপাল মিত্র। জিয়ারুল হককে সম্পাদক, হরেন্দ্রনাথ বর্মনকে সভাপতি ও নমিতা বর্মনকে কোষাধ্যক্ষ করে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে।

বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমছে, এ দেশে কমানো হবে না কেন?

পেট্রোল-ডিজেল-রান্নার গ্যাস সভ্যতার গতিশীলতার বা অস্তিত্বের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। একটা দেশের সরকারের ন্যূনতম দায়িত্ব হল, এগুলি যথাসম্ভব সুলভে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। কিন্তু এ দেশের সরকার করছে তার উল্টো।

আন্তর্জাতিক বাজারে এখন তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৫৪ ডলার কমেছে। গত জুলাই মাসে এই দাম ছিল ব্যারেল প্রতি ১৪৭ ডলার। এখন দাম ৯৩ ডলারে নেমে এসেছে। ভারত তেলের ব্যাপারে আমদানি নির্ভর। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লে ভারতের তেল সংস্থাগুলি এবং কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বাজারে তেলের দাম বাড়ানোর জন্য অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। পূর্বতন বিজেপি সরকার ৫ বছরে বারো বার দাম বাড়িয়েছিল। ইউ পি এ সরকার ইতিমধ্যেই ৯ বার বাড়িয়েছে। অথচ আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম এখন প্রায় অর্ধেক হয়ে গেলেও কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, দেশের বাজারে তেলের দাম কমবে না।

কেন কমবে না? আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে সরকার দেশের বাজারে দাম বাড়ায়। অথচ আন্তর্জাতিক বাজারে দাম প্রায় অর্ধেক হলেও সরকার কেন দাম কমাবে না? সরকারের বক্তব্য হল, তেলের দাম বেড়ে যাওয়ার সময় ভারতীয় কোম্পানিগুলি যে লোকসান করেছিল, এখন তা পুষিয়ে নিচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ইতিপূর্বে যা বেড়েছিল তাতে দেশের বাজারে তেলের দাম না বাড়িয়েও ভারতীয় তেল সংস্থাগুলি লাভ করতে পারে, এটা আমরা নানা লেখায় দেখিয়েছি। আমরা দেখিয়েছি, এক ব্যারেল অশোধিত তেল থেকে যে পরিমাণ পেট্রোল পাওয়া যায়, কেবল তার সাপেক্ষে পেট্রোলের দাম নির্ধারণ করার পদ্ধতি একটি লোকঠকানো প্রক্রিয়া। সরকারি কর্তাব্যক্তিরা এক ব্যারেল (১৫৯ লিটার) অশোধিত তেল থেকে ১০০ লিটার পেট্রোল পাওয়া যায় ধরে নিয়ে হিসাব কষে থাকেন। বাকি ৫৯ লিটার তেল কী হয়? বাকি অশোধিত তেল থেকে পাওয়া যায় রান্নার গ্যাস, ডিজেল, মোবিল, কেরোসিন, সিন্থেটিক কাপড়, পলিমার জাত নানা জিনিস, ডিটারজেন্ট সাবানের উপাদান, নানারকম সুগন্ধী কেমিকেল, সার, ওষুধ, কম্পিউটার ও ক্যালকুলেটরের উপাদান, আধুনিক সড়ক তৈরির অ্যাসফল্ট, মোম ইত্যাদি প্রায় চার হাজার রকম জিনিস — যার মূল্য ধরলে বোঝা যায়, তেল কোম্পানিগুলি যে বিপুল পরিমাণ মুনাফা করছে, তার উৎস কোথায়। ভারতের সুবৃহৎ তেল কোম্পানি রিলায়েন্সের বার্ষিক রিপোর্ট বলছে, ২০০৭-০৮ সালে তারা ১৫,৫৪৬ কোটি টাকা লাভ করেছে। সরকারি কোম্পানি ও এন জি সি-ও ২০০৭-০৮ সালের প্রথম ৬ মাসে ৫০৯৭.৪৮ কোটি টাকা লাভ করেছে। ফলে সরকার যে বলছে, তেল কোম্পানিগুলির লোকসান হচ্ছে, এটা একটা ডাহা মিথ্যা প্রচার ছাড়া কিছু নয়। বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়লে যদি দেশের বাজারে তেলের দাম না বাড়ানো হয়, তাতে মালিকদের বিপুল মুনাফার সামান্য কমতে পারে, লোকসানের কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

ভারতের তেল সংস্থাগুলি 'ইম্পোর্ট প্রাইস প্যারিটির' মাধ্যমে বিপুল মুনাফা করার পথ করে রেখেছে। এই নীতি অনুযায়ী দেশীয় কোম্পানিগুলি দেশের খনি থেকে উত্তোলিত তেল— যার উৎপাদন খরচ আমদানি করা তেলের দামের অর্ধেক বা কখনও কখনও অর্ধেকেরও কম— তা বিদেশ থেকে আমদানি করা তেলের দামের সমান দামে বিক্রি করতে পারবে। দেশি-বিদেশি তেল কোম্পানিগুলির চাপে কেন্দ্রীয় সরকার এই নীতি নিয়েছে, যাতে তারা বিপুল মুনাফা করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষায় 'লোকসানে' চলা ভারতীয় তেল কোম্পানিগুলি এত বিপুল পুঁজির অধিকারী হয়েছে যে, মধ্যপ্রাচ্যে আরব দেশগুলিতে, মধ্য এশিয়ায়, রাশিয়ার শাখালিন দ্বীপে তারা তেল খনি কিনছে।

আজ ভারত তেলের ব্যাপারে আমদানি নির্ভর। এখন প্রয়োজনীয় তেলের ৭৫ শতাংশ ভারতকে আমদানি করতে হয়। কিন্তু এই অবস্থা ভারতের বরাবর ছিল না। সত্তরের দশকের শেষের দিকে ভারত প্রয়োজনীয় তেলের ৭০ শতাংশ দেশের খনিগুলো থেকে উত্তোলন করত। তা হলে এই পরিস্থিতি আজ একেবারে উল্টো হয়ে গেল কী করে? এর মূলে রয়েছে ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে গৃহীত নয়া আর্থিক নীতি। এই আর্থিক নীতি অনুযায়ী ভারত সরকার অন্যান্য বহু লাভজনক সংস্থার মতো তেলক্ষেত্রগুলিকেও দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দিতে শুরু করে। ১৯৯৬ সালে ভারতে ২৩টি তেল উৎপাদনকারী ব্লক দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হয়। যার ফলে ভারতের নিজস্ব তেল অনুসন্ধান ক্ষেত্রে ও তেল শোধন করার ব্যবস্থায় শ্লথতা দেখা দেয়। তেলের মতো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিসে স্বয়ম্ভরতা নষ্ট করে দিয়ে পরনির্ভর করে দিতে পারলে যে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বিদেশ থেকে আমদানি করে অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি করে বিপুল মুনাফা লুঠবে তা বোঝা কঠিন নয়। নব্বইয়ের দশকে কংগ্রেস সরকার ও পরে বিজেপি সরকার তেল উত্তোলন ব্যবস্থাকে অকেজো করে দিয়ে দেশি-বিদেশি মালিকদের বিপুল মুনাফা করার সুযোগ করে দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলিও পেট্রোপণ্যে বিপুল করের বোঝা চাপিয়েছে। পেট্রোলের উপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার গড়ে ৫৪-৫৭ শতাংশ, আর ডিজেলের উপর ৩৬ শতাংশ কর ধার্য করেছে। রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ১৭ শতাংশ কর নিত, এখন তীব্র জনঅসন্তোষ লক্ষ করে ১২.৫ শতাংশ কর নিচ্ছে। তবুও এই কর অন্যান্য কতকগুলি রাজ্যের চেয়ে বেশি। পাঞ্জাব যদি ৯ শতাংশ হারে কর নিতে পারে, তা হলে পশ্চিমবঙ্গে ১২.৫ শতাংশ হারে কর দিতে হবে কেন? কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর কমাবে না? তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতি লিটার পেট্রোল ও ডিজেলে এক টাকা রাজ্যের সেস বসিয়েছে, যা প্রায় কোনও রাজ্যে নেই। ভারতের নানা সংবাদপত্র হিসাব কষে দেখিয়েছে, ভারতে যদি পেট্রোলের উপর সরকারি কর না থাকত, তাহলে এক লিটার পেট্রোল ২৭.৯৬ টাকায় পাওয়া যেত। একইভাবে ডিজেল পাওয়া যেত ২৬.৯৫ টাকা প্রতি লিটার (সূত্র ঃ দি টেলিগ্রাফ, ০৫.০৬.০৮)।

সরকার পুঁজিপতিশ্রেণীর সর্বোচ্চ মুনাফা পাইয়ে দেওয়ার ভূমিকা পালন না করলে এবং জনমুখী মানসিকতা নিয়ে চললে অনায়াসেই তেলের দাম কমতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বৃহৎ পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে বলছে, দাম কমবে না। কংগ্রেস সরকার এ রকমই বলবে। কারণ মালিকদের স্বার্থ রক্ষাই এই দলটির ধর্ম।

পেট্রোল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সিপিএমের ভূমিকা কী? গত জুন মাসে কংগ্রেস নেতৃত্বে ইউ পি এ সরকার যখন পেট্রোলে লিটার প্রতি ৫ টাকা, ডিজেলে ৩ টাকা এবং রান্নার গ্যাসে সিলিন্ডার প্রতি ৫০ টাকা দাম বাড়াল, তখন সিপিএমের সমর্থন তার পিছনে ছিল, সিপিএমের সমর্থন নিয়েই তারা দাম বাড়িয়েছিল। সিপিএম এর বিরুদ্ধে মৌখিক বিবৃতি ছাড়া বাধা দেওয়ার মতো কিছুই করেনি। অন্যান্য রাজ্যে বুর্জোয়া সরকারগুলি নির্বাচনী লক্ষ্যে ভোটের স্বার্থে ভ্যাট কমিয়ে, ভর্তুকি দিয়ে, ট্যাক্স কমিয়ে সামান্য হলেও যতটুকু দাম কমাল, সিপিএম সরকার সেটুকুও না করে শুধু বিক্রয় কর কমালো নামমাত্র। দিল্লি রাজ্য সরকার সিলিন্ডার পিছু ৪০ টাকা ভরতুকি দিয়ে গ্যাসের দাম ৫০ টাকার বদলে ১০ টাকা বাড়িয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার সিলিন্ডার প্রতি ৫০ টাকাই ভরতুকি দিয়েছে। সেখানে দাম বাড়েনি। ঝাড়খন্ড, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ সরকারও কমবেশি গ্যাসে ভরতুকি দিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম সরকার এক পয়সাও ভরতুকি দেয়নি। সে তার ভরতুকির ডালি সিঙ্গুরে টাটা গোষ্ঠীর জন্য ঢেলে দিয়েছে।

অন্যদিকে তেলের দাম বৃদ্ধির জন্য জনগণের সমস্যার কথা না ভেবে বাস মালিকদের লাভ কমে যাওয়ার কথাই ভেবেছে সরকার। প্রথমে সরকার ন্যূনতম ভাড়া অপরিবর্তিত রেখে দ্বিতীয় স্টেজের ভাড়া ৫০ পয়সা বৃদ্ধি ঘোষণা করে। কিন্তু যেই মাত্র বাস মালিকরা হুমকি দিয়ে বলে, এই বর্ধিত ভাড়া তারা মানবে না, তৎক্ষণাৎ বাসমালিক মন্ত্রী দ্বিতীয় দফার ভাড়া এক টাকা বাড়িয়ে দিলেন। এভাবে ন্যূনতম ভাড়া চার টাকার পরের ধাপেই হয়ে গেল ছ'টাকা, যা ভারতের কোনও রাজ্যেই নেই।

টাকার হিসাবে এখন আন্তর্জাতিক বাজারে এক লিটার পেট্রোলের দাম ২৬ টাকারও কম। অথচ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এক লিটার পেট্রোলের দাম ৫২-৫৭ টাকার মধ্যে। কেন্দ্রীয় সরকার জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করলে অনায়াসেই দাম অর্ধেক করে দিতে পারে। শুধু পেট্রোল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসই নয়, অশোধিত তেল থেকে তৈরি সমস্ত পণ্যেরই দাম কমাতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে এ ক্ষেত্রে বাধ্য করার জন্য চাপ সৃষ্টি করবে কে? সংসদে তথাকথিত বামদলগুলির ৬০ জন সাংসদ রয়েছেন। তাঁদের ভূমিকা কী? সরকার ভাঙা-গড়ার খেলার সময় ছাড়া এঁদের অস্তিত্বই টের পাওয়া যায় না। সিপিএম বলে, তাদের জন্যই ইউ পি এ সরকার নাকি জনবিরোধী পদক্ষেপ নিতে পারেনি। এর চেয়ে মিথ্যা ও হাস্যকর আর কী হতে পারে?

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমলে স্বাভাবিকভাবেই দেশীয় বাজারে তেলের দাম কমানোর দাবি উঠবে, সেটা তেল কোম্পানিগুলি ভাল করেই জানে। তাই তারা আগেই পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের উপর চাপ দিচ্ছে, যাতে দাম কমানো না হয়। এই অবস্থায় দাম কমাতে সরকারকে বাধ্য করার জন্য প্রয়োজন গণআন্দোলনের চাপ তৈরি করা। সঠিক নেতৃত্বে গণআন্দোলনের চাপে যে দাবি আদায় করা সম্ভব সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন তা দেখিয়েছে। মুষ্টিমেয় মালিকরা চাপ দিয়ে জিতবে, আর ৯০ শতাংশ সাধারণ মানুষ অসংগঠিতহওয়ার কারণে হারবে— এ জিনিস চলতে দিলে জনজীবনের দুর্ভোগ বাড়বে বই কমবে না।

কোথায় সেই 'বিশেষজ্ঞরা'?

আন্তর্জাতিক বাজারে যখন অপরিশোধিত তেলের দাম চড়চড় করে উঠছিল, কাগজে-পত্রে-টিভিতে-রেডিওতে, সর্বত্র একদল 'বিশেষজ্ঞ' রীতিমতো সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা দাবি তুলেছিলেন, অবিলম্বে দেশের বাজারেও তেলের দাম বাড়াতে হবে। নতুবা নাকি দেশের অর্থনীতির সাড়ে-সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী, তেলের কোম্পানিগুলোর লোকসান খেয়ে মৃত্যু হয়ে যাবে। সরকারি কোষাগার ভর্তুকি দিতে দিতে নাকি একরকম ফাঁকা হয়ে যাবার দশা। এইভাবে চললে দেশের অর্থনীতি রসাতলে যেতে আর বুঝি এতটুকুও দেরি নেই। 'অর্থনীতি গেলে আর রইল কী'? অতএব তেল, রান্নার গ্যাসের দাম অবিলম্বে বাড়ানো ছাড়া আর গতি নেই!

সরকার তৈরি হয়েই ছিল। রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ানো হল একধাপে ৫০ টাকা, পেট্রলের বাড়ানো হল ৫ টাকা, ডিজেলের ৩ টাকা। অবশ্য সহমত না হয়ে আর উপায়ই বা কী ছিল? অর্থনীতিকে তো আর রসাতলে পাঠাতে দেওয়া চলে না! আর যাই হোক, তেল কোম্পানিগুলোর লোকসান তো আর মেনে নেওয়া যায় না! অর্থনীতির নিয়ম কারোর আবেগের ধার ধারে না; তাই সাধারণ মানুষকে একটু আধটু কষ্ট স্বীকার করতে হলে আর কী করা যাবে! এখন কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দর আবার ব্যারেল প্রতি ১৪৭ ডলার থেকে নামতে নামতে ১০০ ডলারেরও তলায় এসে ঠেকেছে। তাই আমাদের মতো নিতান্ত সাধারণ লোকের মোটা মাথায় একটা প্রশ্ন এসে খালি ধাক্কা মারছে। কই, এখন দেশের বাজারে তেলের দাম, রান্নার গ্যাসের দাম তো কমছে না! আর সেইসব 'দিকপাল অর্থনীতিবিদরাই' বা গেলেন কোথায়? তাঁদের শেখানো অর্থনীতির নিয়ম অনুসারেই তো এখন আমাদের পকেটের উপর চাপ একটু হাল্কা হওয়ার কথা। তাহলে তাঁদের এখন কোনও রা নেই কেন?

অবশ্য আমাদের মাথা নিতান্তই মোটা। তাঁদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মস্তিষ্কের নাগাল পাওয়া আমাদের সাধ্যের অতীত। তাই কোন্ সূক্ষ্ম অর্থনীতির নিয়ম ধরে তাঁরা এখন তেলের ও রান্নার গ্যাসের আগের ঐ বর্ধিত মূল্যই বজায় রাখাকে সমর্থন করছেন, আমাদের মাথায় তা ঠিক ঢুকছে না। শুধু টের পাচ্ছি, আমাদের পকেটের উপর চাপ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। অবশ্য নিন্দুকে বলছে, তেলের কোম্পানিগুলি নাকি এই সুযোগে হাজার হাজার কোটি টাকার লাভের কড়ি ঘরে তুলছে।

কাঁথি কলেজে
ডি এস ও-তৃণমূল ছাত্র পরিষদ জোট নির্বাচনে জয়ী

কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচনে টিএমসিপি-ডিএসও জোট প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছাত্র সংসদ দখল করেছে। টিএমসিপি-এর পক্ষে সুব্রত প্রধান ও ডিএসও-র পক্ষে বিশ্বজিৎ রায় এক যৌথ বিবৃতিতে জানান যে দুই সংগঠনের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকলেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ছাত্রস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে, কলেজে কলেজে বিরোধী ছাত্র সংগঠনের উপর এস এফ আইয়ের ফ্যাসিস্ট আক্রমণের প্রতিবাদে, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চুরি, দুর্নীতি ও রেজাল্ট কেলেঙ্কারি রুখতে এবং কাঁথি কলেজের সার্বিক উন্নয়নের দাবিতে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। কলেজের বহু অধ্যাপক ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ডিএসও বিজ্ঞান বিভাগের দুটি আসনে জয়লাভ করেছে। বাকি আসনগুলি পেয়েছে জোটসঙ্গী টি এম সি পি।

খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশে

রাজ্যে ৪৬ লক্ষ মানুষ জীবিকাচ্যুত হবে

খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটলে তাদের সাথে অসম প্রতিযোগিতায় হকার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা যে উচ্ছেদ হয়ে যাবে, তাদের অস্তিত্বই যে সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে এমন আশঙ্কা থেকেই অন্যান্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যের ব্যবসায়ীরাও প্রবল প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ব্যবসায়ীদের এই আশঙ্কা অমূলক নয়। রাজ্যে রাজ্যে যেখানেই বৃহৎ ব্যবসায়ীদের শপিং মল গড়ে উঠেছে, সেখানেই খুচরো ব্যবসায়ীদের বিক্রি মারাত্মকভাবে কমে যাচ্ছে। শপিং মল চালু হওয়ার ফলে খুচরো ব্যবসা কীভাবে মার খাচ্ছে সে সম্পর্কে ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি (২-৮ জুন ২০০৭) গত বছরে এক সমীক্ষা রিপোর্টে দেখিয়েছে, মুম্বই শহরে ২৭টি শপিং মলের দরুন খুচরো ব্যবসায়ীদের বিক্রি ৭১ শতাংশ কমে গেছে। এর মধ্যে মুদি দোকানে ৮৭ শতাংশ, শাকসব্জি ও ফলমূলের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ, তৈরি খাবারে ৪৪ শতাংশ, পোশাকে ৮৬ শতাংশ, জুতোয় ৮৩ শতাংশ, ইলেকট্রনিক্স-এ ১০০ শতাংশ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে ১০০ শতাংশ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫৮ শতাংশ বিক্রি কমেছে। দিল্লিতে তিনটি রিলায়েন্স ফ্রেশ আউটলেটের আশপাশের এলাকায় সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, শতকরা ৮৮ ভাগ দোকানের বিক্রি কমে গেছে। এর মধ্যে ৪৫ ভাগের বিক্রি অর্ধেকেরও নিচে চলে গেছে।

শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের যেখানেই খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজি ঢুকেছে সেখানেই তা খুচরো ব্যবসায়ীদের ভিটেছাড়া করেছে। এই দৈত্যাকার পুঁজির সাথে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে না পেরে আর্জেন্টিনায় ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ খুচরো দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। চিলিতে ১৯৯১ থেকে ৪ বছরের মধ্যে ২০ শতাংশ খুচরো দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। আমেরিকার আইওয়া শহরে ওয়ালমার্টের বিপণিগুলির বিক্রয়ের ৮৪ শতাংশই সম্ভব হয়েছে চালু খুচরো ব্যবসাকে ধ্বংস করে। শুধু খুচরো ব্যবসায়ীরা নয়, পাইকারি ব্যবসায়ীরাও দ্রুত ব্যবসা হারাচ্ছেন। জার্মানির বৃহৎ পুঁজি 'মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি' ব্যাঙ্গালোর ও হায়দ্রাবাদে ব্যবসা শুরু করার পর এই শহর দু'টির পাইকারি ব্যবসায়ীরা দ্রুত ব্যবসা হারাচ্ছেন। খুচরো ব্যবসায়ীরা বাস্তবে বৃহৎ পুঁজির হাঙরদের করাল গ্রাসের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। হয় বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, নয় মৃত্যু অনিবার্য। এই হল বাস্তব অবস্থা।

সমীক্ষকরা বলছেন, ভারতে খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজি ঢুকলে কমপক্ষে ১৬ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা ধ্বংস হয়ে যাবে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম শহর মিলিয়ে খুচরো দোকানের সংখ্যা ১১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬৬৬টি। একটি দোকানের আয়ের উপর ৪ জন মানুষ নির্ভরশীল ধরলে এ রাজ্যে কমপক্ষে ৪৬ লক্ষ মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়বে।

প্রশ্ন হল, এই বিপদের কথা সম্যকভাবে জেনেও কংগ্রেস, বিজেপি এবং এ রাজ্যের সিপিএম কেন বৃহৎ পুঁজিকে খুচরো বাজারে প্রবেশ করতে দিচ্ছে? কেন তারা খুচরো ব্যবসায়ীদের বৃহৎ পুঁজির হাঙরদের মুখের সামনে ঠেলে দিচ্ছে? প্রশ্ন হল, বৃহৎ পুঁজিকেই বা কেন খুচরো ব্যবসায় ঢুকতে হচ্ছে? পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে কী এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হল যে, আমেরিকার দৈত্যাকার পুঁজি ওয়ালমার্টকে, জার্মানির মেট্রো গ্রুপকে, ইংল্যান্ডের টেসকোকে তেলেভাজা, ধনেপোতা-শাকসব্জি বিক্রির বাজারে ঢুকতে হচ্ছে? ভারতের পুঁজিবাদী অর্থনীতিরই বা কী এমন পরিস্থিতি হল যে গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীকে গড়িয়াহাটে চাল ডাল মশলা সরষের তেল বিক্রির ব্যবসাতে নামতে হচ্ছে? সত্যানুসন্ধানী মন নিয়ে যে কেউ খোঁজ করলে দেখতে পাবেন এর পেছনে রয়েছে পুঁজিবাদের তীব্র বাজার সংকট। গোটা বিশ্বে পুঁজিবাদ তীব্র বাজার সংকটে জর্জরিত। দেশের ৯০ ভাগ মানুষকে শোষণ করে এই পুঁজিপতিরা বিপুল পুঁজির অধিকারী হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি তাদের মুনাফাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই বিপুল পুঁজি বিনিয়োগের জায়গা চাইছে। অথচ বিনিয়োগের বাজার সংকুচিত। দেশের ১০ ভাগ মানুষের অঢেল ক্রয়ক্ষমতা থাকলেও ৯০ ভাগ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাস্তবে খুবই করুণ। ৯০ ভাগ মানুষের কেনার ক্ষমতা পুঁজিপতিরাই শোষণ করে নিঃশেষ করে দিয়েছে। পুঁজিপতিরাই শোষণ করে খদ্দেরকে বাজার থেকে হঠিয়ে দিচ্ছে। ফলে খদ্দের নেই, বাজারে মন্দা। বিনিয়োগ হলে কিনবে কে? উৎপাদন হলে কিনবে কে? এই কারণেই গোটা বিশ্বের শিল্পে আজ সংকট। এই কারণেই 'শিল্পায়ন' 'শিল্পায়ন' বলে গলা ফাটালেও এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কেন স্বয়ং ব্রহ্মা এসে চেষ্টা করলেও পুঁজিবাদের এই সংকটের অধ্যায়ে শিল্পায়ন সম্ভব নয়। পুঁজিবাদই শিল্পায়নের সামনে প্রধান বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

এই অবস্থায় দেশীয় একচেটিয়া পুঁজি, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ১১০ কোটি মানুষের দেশ ভারতের যে বিশাল বাজার, খুচরো বাজার তাতে উদ্বৃত্ত অলস পুঁজি বিনিয়োগ করতে চাইছে। তারা কেন্দ্রের সরকার এবং রাজ্যের সরকারগুলির উপরে চাপ দিয়ে চলেছে যাতে খুচরো ব্যবসা তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার দোহা বৈঠকে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ভারতে বিনিয়োগের জন্য খুচরো বাজার খুলে দিতে ভারত সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থবাহী সরকার তা মেনেও নেয়। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির লক্ষ্য বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বেধে বিদেশের বাজারে ঢোকা, সেখানে পুঁজি বিনিয়োগ করা। ফলে দেশিবিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থে তাদের চাপেই ভারত সরকার দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যালোচনার সময় খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি প্রবেশের অনুমতি দেয়।

খুচরো বাজারে বৃহৎ পুঁজির আক্রমণ কোন আকস্মিক বিষয় নয়। এই আক্রমণ আসছে পুঁজির নিয়মেই। বৃহৎ পুঁজি ক্ষুদ্র পুঁজিকে গিলে খায়, বৃহৎ পুঁজি তার প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিকে বাজার থেকে নানা কায়দায় উৎখাত করে — এটাই পুঁজিবাদের নিয়ম, অবশ্যই জঙ্গলের নিয়ম, বর্বরের নিয়ম। এই কারণেই পুঁজিবাদ অসহনীয়, অমানবিক এবং তার অবসান এত জরুরি।

২০০৫ সালে প্রকাশিত ভারত সরকারের কনজিউমার্স অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতে প্রথমে ৪৯ শতাংশ বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগে অনুমোদন দেওয়া হবে, তারপর ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে ১০০ শতাংশ অনুমোদন দেওয়া হবে। এটা ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন যে, এর ফলে খুচরো ব্যবসায় প্রলয়ঘূর্ণি তৈরি হবে।

কেউ কেউ বলছেন, বিদেশি পুঁজি এলে, বিনিয়োগ হলে চাকরি হবে। কত জনের চাকরি হবে? আর কতজন কাজ হারাবে? বাস্তবে শপিং মলে ১ জন কাজ পেলে শপিংমলের জন্য বন্ধ হওয়া দোকানগুলির কমপক্ষে ৪০ জন কাজ হারাবে। ফলে এই ধরনের বিনিয়োগে বেকারি ভয়ঙ্কর রূপ নেবে। অর্থনীতিতে আরও বিপর্যয় নেমে আসবে।

অন্যদিকে মূল্যবৃদ্ধিও মারাত্মক রূপ নেবে। প্রথম দিকে এরা কম দামে জিনিস বিক্রি করবে। ফলে আশপাশের খুচরো দোকানে জিনিস বিক্রি বন্ধ হয়ে যাবে। তারা লোকসানের মুখে পড়বে। তারা পুঁজি ধরে রাখতে পারবে না, বাজার থেকে হঠে যাবে। তখন বাজারে বৃহৎ পুঁজিরই একচেটিয়া মালিকানা কায়েম হবে। তখনই শুরু হবে আসল খেলা। শুরু হবে ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি, এবং শপিং মল থেকেই ক্রেতাকে বেশি দামে জিনিস কিনতে হবে। ফলে খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির প্রবেশের পরিণামে শুধু ব্যবসায়ীরাই বিপন্ন হবে তা নয়, সাধারণ মানুষের জীবনও বেকারিতে, মূল্যবৃদ্ধিতে বিপর্যস্ত হবে।

এইরকম একটি ভয়ঙ্কর বিপদের সামনে দেশের মানুষকে ঠেলে দিল কংগ্রেস, বিজেপি প্রভৃতি পুঁজিপতিশ্রেণীর বিশ্বস্ত দলগুলি। এ বিষয়ে সিপিএমের বক্তব্য কী? সিপিএম কি খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে? এ বিষয়ে সিপিএমের অবস্থান ভাবের ঘরে চুরি করার মতো। খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটলে কী কী সর্বনাশ হবে তা স্পষ্ট করে বলেও সিপিএম নিয়ন্ত্রিত আকারে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ চাইছে। সিপিএমের পলিটব্যুরো এক প্রস্তাবে বলেছে, 'সংগঠিত খুচরো ব্যবসার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে।' তারা বলেছে, 'সংগঠিত খুচরো ব্যবসাকে এমনভাবে বেড়ে উঠতে দেওয়া যাবে না, যার ফলে অসংগঠিত খুচরো ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ ঘটবে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে জীবিকাচ্যুতি ও কর্মহীনতা নেমে আসবে'। অর্থাৎ তাঁদের বক্তব্য খুচরো ব্যবসায় সংগঠিত বৃহৎ পুঁজি আসুক, কিন্তু তা যেন অসংগঠিত স্বল্পপুঁজির খুচরো ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ না করে। বৃহৎ পুঁজি ক্ষুদ্র পুঁজিকে উচ্ছেদ করবে না এ কখনও হয়? আসলে সিপিএম বৃহৎ পুঁজিকে ভিন্ন ভাষায় স্বাগত জানাচ্ছে।

রাজ্য বিপণন পর্ষদের চেয়ারম্যান নরেন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে সব মিলিয়ে প্রায় ৫০টি মল চালু হয়েছে। যদিও বাস্তবে শপিংমলের সংখ্যা অনেক বেশি। নরেনবাবু বলেছেন, এই মলগুলি চালু করার জন্য তাদের দফতরের অনুমতি নেওয়া হয়নি। এ কখনও হয়? রাজ্য সরকার বা সিপিএমের প্রশ্রয় না থাকলে এই মলগুলি কি চালু হতে পারত? যদি সত্যিই এগুলো তাদের অনুমতি ছাড়া হয়ে থাকে তাহলে এর বিরুদ্ধে তারা কী পদক্ষেপ নিয়েছে? তারা কার্যত শপিং মলের বিরুদ্ধে কোনও ভূমিকাই নেয়নি। গড়িয়াহাটে গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর খুচরো বিপণন কেন্দ্র স্পেনসার্স হাইপার মার্কেট উদ্বোধনের সময় হকাররা তীব্র প্রতিবাদ জানালে রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী হুমকির সুরে বলেছিলেন, ''গড়িয়াহাটে ওই শপিং মল হবেই।.... কোনও হরিদাস পাল হকার নেতা তা আটকাতে পারবেন না'' (আনন্দবাজার ৬.৭.০৮)। এ বিষয়ে সিটু নেতা শ্যামল চক্রবর্তীর বক্তব্য কী? শ্যামলবাবু 'খুচরো বিপণনে দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজি বিনিয়োগের বিপদ' নামে একটি পুস্তিকা লিখলেও নিয়ন্ত্রিত আকারে শপিং মলের পক্ষে তিনিও। শ্যামলবাবুর ভাষায়, ''যেখানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও হকার নেই, সেখানে এমন শপিং মল নিঃসন্দেহে

সাতের পাতায় দেখুন

ভারতের বৈদেশিক ঋণ বাড়ছে লাগামছাড়া

উন্নয়নের ঢাকের বাদ্যি যত জোরে বাজানো হচ্ছে, ততই বাড়ছে ভারতের বিদেশি ঋণের বোঝা। মহাভারতের কাহিনীতে বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেছিল — মহারাজ, পৃথিবীতে সুখী কে? যুধিষ্ঠিরের জবাব ছিল, যিনি অঋণী এবং অপ্রবাসী তিনিই সুখী। আজকে বিশ্বায়নের যুগে আমাদের শেখানো হচ্ছে, ভোগই জীবন। টাকা না থাকলে ধার করো! ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড, কিস্তিতে জিনিস কেনা, সবকিছুর পিছনে চিন্তাটা ওই। কেবল ব্যক্তিগত স্তরেই নয়, সরকারি স্তরেও হিসাবের খাতায় ঋণ এখন দায় নয়, ঋণ হল আয়। ভারতের যত 'উন্নয়ন' হচ্ছে, ততই বাড়ছে দেশি-বিদেশি ঋণের বোঝা। ২০০৭-০৮ সালে ভারতবর্ষের বিদেশি ঋণ বেড়েছে গত বছরের তুলনায় ৩০.৪ শতাংশ। মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২ হাজার ১২১ কোটি ডলার। ১১০ কোটি ভারতবাসীর মাথাপিছু বিদেশি ঋণ হল ৮ হাজার ৬৪৭ টাকা। এর মধ্যে রয়েছে বিদেশি বাণিজ্যিক ঋণ, অর্থাৎ বিদেশের ব্যাঙ্ক বা অর্থলগ্নি সংস্থা থেকে নেওয়া ঋণ। এরও পরিমাণ বেড়েছে ৪৯ শতাংশ। ২০০৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিদেশি বাণিজ্যিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ১৬৬ কোটি ডলার, ২০০৮ সালের ৩১ মার্চ তা বেড়ে হয়েছে ৬ হাজার ২২০ কোটি ডলার।

বাণিজ্যিক ঋণ প্রধানত নেন শিল্পপতিরা, যার দায় বইতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে, অর্থাৎ শেষপর্যন্ত জনগণকে। কীভাবে বইতে হয়? জনগণ তো কোনও টাকা শোধ করে না, কার কাছে ধার তাও জানে না! আদতে বিদেশি ঋণ ভারতীয় টাকায় আসে না, ভারতীয় টাকায় তা শোধও করা যায় না। সেজন্য চাই ডলার বা অন্য কোনও গ্রহণযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা।

এই বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায় তিনভাবে। প্রথমত, বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে। দ্বিতীয়ত, বিদেশ থেকে এদেশে পুঁজি বিনিয়োগ ঘটাতে পারলে। তৃতীয়ত, নতুন করে ধার করে। প্রথম রাস্তায় বিদেশি মুদ্রা অর্জনের জন্য আমাদের মতো দেশের সরকার সর্বদা রপ্তানি বাড়াবার চেষ্টায় সরকারি তহবিল থেকে রপ্তানি পণ্যে ভরতুকি দেয়, রপ্তানিকারক শিল্পপতিদের নানা ছাড় ও সুযোগসুবিধা দেয়। দেশের কাঁচামাল, খনিজদ্রব্য এমনকী চাল-গম পর্যন্ত বিদেশে চালানের ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয়ত, বিদেশি পুঁজিকে দেশে ডেকে আনে কর ছাড়, বেসরকারীকরণ সমেত নানা সুবিধা নিয়ে। তৃতীয়ত, নতুন করে ধার করে সেই টাকায় পুরনো ধারের কিস্তি শোধ করে। সবটা মিলিয়ে একদিকে বিদেশি পুঁজির লুণ্ঠনের পথ পরিষ্কার হয়, দেশে খাদ্যদ্রব্যের ও কাঁচামালের দাম বাড়ে এবং অবাধে বিদেশি বিনিয়োগ, বিশেষত ফাটকা বাজারে বিনিয়োগ টাকার জোগান বাড়িয়ে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ডেকে আনে। অন্যদিকে ধারের সুদ ও আসলের কিস্তির টাকা গুনতে সরকারি বাজেটের বিরাট অংশ বেরিয়ে যায়। বর্তমানে ভারত সরকারের বাজেটে প্রতি এক টাকা ব্যয়ের মধ্যে ২৬ পয়সাই যায় দেনার দায় মেটাতে। আর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে সরকারি টাকা খরচের দাবি উঠলেই সরকার টাকার অভাবের অজুহাত দেখায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই এমন যে, এখানে শিল্পপতিরা ধার করে ধারের টাকায় ব্যবসা করে মুনাফা লোটে। আর মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্য ও কাঁচামাল চালান এবং জনকল্যাণমূলক খাতে সরকারি ব্যয় হ্রাসের মধ্য দিয়ে ধারের দায় এসে পড়ে জনগণের ঘাড়ে। স্বাধীনতার পর থেকেই এই জিনিস চলছে। এখন পুঁজিবাদ আরও গভীরতর সংকটে পড়ে উদারীকরণ, বেসরকারীকরণের পথ ধরায় সমস্যা অতি দ্রুত বাড়ছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি মালিকদের স্বার্থ দেখছে জনস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে।

(তথ্যসূত্র ঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দেওয়া তথ্য, দি স্টেটসম্যান ৪-০৯-০৮)

সিঙ্গুর আজ আর সেই ‘ডেট্রয়েট’ হতে পারে না

পুঁজিমালিকদের ধামাধরা একশ্রেণীর ‘বিশেষজ্ঞ’ ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, টাটারা মোটরগাড়ি কারখানা খুললে সিঙ্গুর ‘পশ্চিমবঙ্গের ডেট্রয়েটে’ পরিণত হবে।

কেমন সেই স্বপ্নের ডেট্রয়েট শহর? কেমন আছেন সেখানকার মানুষ? ইতিহাস বলছে, আমেরিকার মিচিগান রাজ্যে অবস্থিত ডেট্রয়েটের নাম ছিল ‘মোটরগাড়ি শহর’ (অটোমোবাইল সিটি)। উনিশ শতকের শেষ দিকেও এই শহর ছিল অত্যন্ত সাধারণ এক শিল্পশহর। শিল্প গড়ে ওঠার সমস্ত রকম সুবিধা থাকায় ১৯০৩ সালে এখানেই হেনরি ফোর্ড তৈরি করেন তাঁর প্রখ্যাত ‘ফোর্ড মোটর কোম্পানি’। হেনরি ফোর্ডের পরিকল্পনায় মোটরগাড়ি শিল্পের আধুনিকীকরণ ঘটল ডেট্রয়েটের কারখানায়। উৎপাদনের পরিমাণ ও পদ্ধতি বিপুল ভাবে পরিবর্তিত হল। মোটরগাড়ি শিল্পে কর্মসংস্থানের জোয়ার সৃষ্টি হল। হেনরি ফোর্ড দক্ষ ও অনুগত শ্রমিক পাওয়ার জন্য উঁচু মজুরির হার ধার্য করলেন। ভাল মজুরির আশায় আমেরিকার বিভিন্ন এলাকা থেকে অসংখ্য মানুষ এই ‘মোটরগাড়ি শহর’-এ এসে জড়ো হল। সেই সময় মোটরগাড়ি শিল্পে বহু সংখ্যক শ্রমিকের দরকার হত এবং ফোর্ড কোম্পানির এক একটি বৃহৎ কারখানায় তখন এমনকী ৯০ হাজারের মতো শ্রমিকও কাজ করেছে।

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রতি ৬ জন পিছু ১ জন কর্মরত মার্কিন মানুষ মোটরশিল্পে কাজ করত। ডেট্রয়েট হয়ে উঠেছিল মোটরগাড়ি শিল্পের প্রাণকেন্দ্র। ততদিনে সেখানে ‘জেনারেল মোটর্স’ এবং ‘ক্রাইসলার’-এর মতো প্রখ্যাত মোটরগাড়ি নির্মাণ সংস্থাও কাজ শুরু করেছে। গড়ে উঠেছে মোটরগাড়ি নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত আরও অসংখ্য কলকারখানা। কর্মসংস্থান হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের।

প্রভূত মুনাফা করার সাথে সাথে দৈত্যাকার এইসব মোটরগাড়ি সংস্থাগুলি একদিকে যেমন সমাজসেবামূলক কিছু কাজ করেছে, অন্যদিকে শ্রমিক আন্দোলন দমন করার জন্য ভাড়াটে গুণ্ডা নিয়োগ করা থেকে শুরু করে আরও বিভিন্ন উপায়ে আন্দোলনকারী শ্রমিকদের বহু রক্ত ঝরিয়েছে। তা সত্ত্বেও এখানকার শ্রমিক সংগঠন ‘ইউনাইটেড অটোমোবাইল ওয়ার্কার্স’ দিনের পর দিন আন্দোলন চালিয়ে শ্রমিকদের বহু দাবি আদায় করেছে। তুলনামূলকভাবে উঁচু হারে মজুরি এবং নানা সামাজিক সুরক্ষার বলয় সেই সময় ঘিরে থাকত ডেট্রয়েটের মোটর শ্রমিকদের। সমাজবিজ্ঞানীরা বলতেন, ডেট্রয়েটের শ্রমিকদের ‘বুর্জোয়াকরণ’ হয়ে গিয়েছে — তারা এখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ।

১৯৫০ সাল নাগাদ ডেট্রয়েট ছিল আমেরিকার পঞ্চম বৃহত্তম শহর। সেখানে তখন বাস করত প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ। কিন্তু এর পরেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির সামগ্রিক মন্দার ছায়া মোটরগাড়ি শিল্পেও এসে পড়ল। একের পর এক মোটর কারখানা বন্ধ হতে শুরু করল, চলতে লাগল নির্বিচারে ছাঁটাই। ইতিমধ্যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটায় শ্রমিকের প্রয়োজন উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেছে। আগে যেসব কারখানায় কাজ করত ৩০ হাজার মানুষ, সেখানে এখন কাজ থাকল মাত্র দু-এক হাজার শ্রমিকের। এইভাবে চলতে চলতে ১৯৭০ সাল নাগাদ মার্কিন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ‘গর্ব’ ডেট্রয়েট শহর চূড়ান্ত দৈন্যদশায় পৌঁছল।

মরতে বসা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করার দাওয়াই হিসাবে ১৯৯০-এর দশকে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা বিশ্বায়নের নামে আবার সেই পুরনো মুক্ত বাজার ব্যবস্থার জয়গান শুরু করলেন। কিন্তু এই ওষুধের বিশেষ প্রভাব ডেট্রয়েটের মোটর শিল্পে পড়তে দেখা গেল না। বরং ভয়ঙ্কর বাজার সংকটের সামনে পড়ে মোটরগাড়ি বিক্রির হার কমে গেল। ফলে ডেট্রয়েটের তিন বৃহৎ মোটরগাড়ি নির্মাণ সংস্থা — জেনারেল মোটর্স, ফোর্ড এবং ডেইমলার-ক্রাইসলার ব্যাপক হারে উৎপাদন কমিয়ে ফেলল, চাকরি চলে গেল হাজার হাজার কর্মীর।

মুমূর্ষু ডেট্রয়েটে অবশিষ্ট কারখানাগুলি এখনও একের পর এক বন্ধ হয়ে চলেছে, কাজ হারাচ্ছে অগুনতি মানুষ। অনুসারী শিল্পগুলি এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। বিরাট বিরাট কারখানার শেডগুলি এখন ঘুমন্ত দৈত্যপুরীর মতো খাঁ খাঁ করে। ডেট্রয়েটে আজ বাস করেন মাত্র ৮ লক্ষের কিছু বেশি মানুষ, যাদের এক-তৃতীয়াংশই রয়েছেন দারিদ্রসীমার নিচে।

কেন বিশ্ববিখ্যাত ‘অটোমোবাইল সিটি’র আজ এই দৈন্যদশা? আসলে শুধু ডেট্রয়েট নয়, গোটা পৃথিবীতে কোথাও কোনও শিল্পেরই সমৃদ্ধি ঘটার সম্ভাবনা আজ আর নেই। হেনরি ফোর্ডদের উদ্যোগে সেসময় উৎপাদনের বান ডেকেছিল, ব্যাপক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছিল; কারণ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তখনও আজকের মতো মন্দা দেখা দেয়নি। কিন্তু আজ পুঁজিবাদের অন্তিম লগ্নে উৎপাদনের কিংবা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সেই সমৃদ্ধি ঘটা কোনমতেই সম্ভব নয়। গোটা বিশ্বজুড়ে আজ প্রবল বাজারসংকট, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ভীষণ ভাবে কমে গেছে। আমেরিকায় একটার পর একটা ব্যাংক ও লগ্নি সংস্থা দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে ধারের টাকা মেটাতে না পেরে। গোটা অর্থনীতির মতোই মোটরগাড়ি শিল্পেরও আজ এমনই ভয়ংকর দুর্দশা যে এক মার্কিন বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন— আমেরিকার সব ক'টি মোটরগাড়ি কারখানা যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলেও ইতিমধ্যে তৈরি হওয়া সমস্ত মোটরগাড়ি বিক্রি করার মতো বাজার নেই। ডেট্রয়েট শহরে এখন ৭২ হাজারেরও বেশি মানুষ গৃহহীন অবস্থায় রয়েছেন। গোটা আমেরিকার অন্যান্য বহু শহরের মতো এখানেও ঋণগ্রস্ত নাগরিকদের বসতবাড়ি দখল করে নিয়েছে ঋণদাতা ব্যাঙ্কগুলি। ফুটপাতে আশ্রয় নেওয়া শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ মানুষদের পুনর্বাসনের দাবিতে গোটা মিচিগান জুড়েই চলছে আন্দোলন, মিছিলে পা মেলাচ্ছে অসংখ্য মানুষ।

সিঙ্গুরে টাটারা যতই আজ নতুন করে গাড়ি কারখানা খুলুক সেই কারখানার উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান আজকের মৃতপ্রায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিয়ম মেনেই নিয়ন্ত্রিত হবে, তার বাইরে যেতে পারবে না। ফলে রতন টাটা, তাঁর শত উদ্যোগ এবং পুঁজির জোর সত্ত্বেও আজ আর হেনরি ফোর্ড হতে পারবেন না; সিঙ্গুরও বিশ শতকের ডেট্রয়েট হতে পারবে না।

উন্নয়নের ফেরিওয়ালাদের কাছে প্রশ্ন, ডেট্রয়েটের বর্তমান হাল কি তাঁরা জানেন না, নাকি সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্য থেকেই সিঙ্গুরকে ডেট্রয়েট বানাবার স্বপ্ন তাঁরা বাতাসে ছড়াচ্ছেন?

ভেনেজুয়েলা গেলেন কমরেড মানিক মুখার্জী

ভেনেজুয়েলায় এবার লাতিন আমেরিকার পার্লামেন্ট অধিবেশন উপলক্ষে বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী ২১ সেপ্টেম্বর ভেনেজুয়েলার উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। লাতিন আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে ২ বছর অন্তর সেখানে ‘লাতিন আমেরিকার পার্লামেন্ট’ নামে বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবার সেটি হচ্ছে ভেনেজুয়েলায়। এই অধিবেশনে বক্তব্য পেশ করার জন্য কমরেড মানিক মুখার্জী সেখানে গিয়েছেন।

এই সরকারের কোনও বিশ্বাসযোগ্যতাই নেই

একের পাতার পর

বেশি’ জমি এবং এই হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী প্রকল্পের ভিতর মাত্র ৭০ একর জমি দেওয়ার কথা বললেন। এমনকী রাজ্যপালের উপস্থিতিতে প্রকল্পের মধ্যে এবং বাইরে এক সপ্তাহের মধ্যে জমি খুঁজে বের করে তা সরকারকে রিপোর্ট করার জন্য চার জনের যে কমিটি তৈরি হয়েছিল, তা মাঝপথেই বাতিল করে দেওয়া হল, দিল্লি থেকে রাজ্যপালের ফিরে আসা পর্যন্তও অপেক্ষা করা হল না। কেড়ে নেওয়া জমি ফেরত দিয়ে চাষিদের ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়েছে চুক্তিতে। সরকার চুক্তি অগ্রাহ্য করে, বিরোধীদের মতামতের তোয়াক্কা না করে, টাকার অঙ্কে ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করে সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিল। অর্থাৎ বিরোধীপক্ষ এবং রাজ্যপালকে ন্যূনতম মর্যাদা না দিয়ে সরকার একতরফাভাবে চুক্তিকে অগ্রাহ্য করল। যে সরকার রাজ্যপালের উপস্থিতিতে সম্পাদিত চুক্তিকে এভাবে পদদলিত করে, সেই সরকারের কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে কি? সরকারের দেওয়া কোনও প্রতিশ্রুতির উপর চাষিরা তথা রাজ্যের মানুষ আর নির্ভর করতে পারে কি? স্বভাবিকভাবেই সরকার যে প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, তাতে চাষিদের কোনও আগ্রহ নেই।

প্যাকেজে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের চাকরির যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা দেখলেই সরকারের চালাকির চরিত্রটা ধরা পড়ে যাবে। বলা হয়েছে, ‘যে সমস্ত পরিবারের কোনও নিয়মিত কাজ বা আয় নেই, সেই সমস্ত পরিবারপিছু একজনকে সরকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের চেষ্টা করবে।’ সিপিএম নেতারা এতদিন চিল চিৎকার করে আসছেন যে, কর্মসংস্থানের জন্যই টাটার প্রতি তাঁদের এত দরদ। মুখ্যমন্ত্রী বক্তৃতায় দু’বেলা বলছেন, টাটার কারখানা হলে কর্মসংস্থানের বন্যা বয়ে যাবে। তবে কেন জমিদাতাদের পরিবারের জন্য তার ছিটে-ফোঁটাও জুটবে না? কেন প্যাকেজে তার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি নেই? কেন শুধু ‘কর্মসংস্থানের চেষ্টা করবে’ বলা হয়েছে? আসলে তাঁরাও জানেন, আধুনিক এই কারখানায় এমন কিছু কর্মসংস্থান হবে না, অন্তত জমিহারা কৃষকদের পরিবারের জন্য চাকরি জুটবে না।

শুধু সিঙ্গুর নয়, গোটা রাজ্যজুড়ে সাধারণ মানুষ সরকারের চুক্তি লঙ্ঘনের এই চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারী আচরণে ধিক্কার জানাচ্ছেন; বলছেন, যে চুক্তিতে রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শিল্পমন্ত্রী স্বাক্ষর করেন, রাত পোহাতেই তাকে এভাবে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া আর যাই হোক, সরকারের সততার পরিচয় নয়। সরকার সত্যিই দ্রুত জমি সমস্যা মিটিয়ে প্রকল্পের কাজ শুরু করতে চাইলে কখনওই চুক্তি থেকে এভাবে পিছিয়ে যেত না। বরং অনুসারী শিল্পের নামে বরাদ্দ জমির কিছুটা ছেড়ে দিতে টাটাদের বাধ্য করত। এ কথা আজ পরিষ্কার যে, মূল কারখানার সঙ্গেই অনুসারী কারখানাগুলি গড়তে হবে, এটি টাটাদের গোঁ ছাড়া আর কিছু নয়, যা তারা রাজ্যের মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চায় এবং রাজ্য সরকারও টাটার সেই আবদারের কাছে মাথা নত করে চলেছে। একদিকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে, অন্যদিকে চাপ দিয়ে সরকার অনিচ্ছুক চাষিদের মনোবল ভাঙতে চাইছে। এজন্যই ‘প্যাকেজ’ ঘোষণার সঙ্গে ২২ সেপ্টেম্বর শেষ দিন ধার্য করে গ্রামে গ্রামে প্রচার চালানো হচ্ছে যে, জমির দাবি ছেড়ে ২২ তারিখের মধ্যে টাকা না নিলে, জমি ও টাকা দুটোই যাবে। চাষিদের জীবন-জীবিকা নিয়ে যে সরকার এই হীন পথ নিতে পারে, তার জনবিরোধী স্বৈরাচারী চরিত্র ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে কি?

এই প্রশ্নও আজ ব্যাপকভাবে উঠছে, যে টাটারা অনিচ্ছুক চাষিদের দিকে আঙুল তুলে বলছে, আন্দোলন হলে তারা প্রকল্প সরিয়ে নিয়ে যাবেন, তারা কি আন্দোলনের কথা এখনই প্রথম শুনল? চাষিরা কি আজই তাঁদের অনিচ্ছার কথা জানাচ্ছেন? যেদিন প্রকল্পের কথা প্রথম ঘোষিত হয়, সেদিনই কি চাষিরা তাঁদের অনিচ্ছার কথা জানাননি, জমি দখলের প্রতিবাদ করেননি? ২০০৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর সিঙ্গুর বিডিও অফিসে এবং ২ ডিসেম্বর চাষিদের বাড়ি বাড়ি ঢুকে পুলিশ কি নৃশংস অত্যাচার চালায়নি? কই সেদিন তো টাটারা বলেনি, তারা সিঙ্গুর প্রকল্প করবে না! তারা ভেবেছিল, সিপিএম নেতারা যেহেতু কথা দিয়েছেন জমি দখল করে দেবেন, অতএব চাষিরা যত বিরোধিতাই করুক, তাতে কান দেওয়ার দরকার নেই। তাই বলেছিল, মাথায় বন্দুক ঠেকালেও সিঙ্গুর ছেড়ে যাচ্ছি না। অথচ আজ যখন দেখছে আন্দোলন ব্যাপক রূপ নিয়েছে, তখন চলে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে। সিপিএম নেতারাই বা টাটাদের এমন কথা দিয়েছিলেন কী করে? তাঁরা নিজেদের কী মনে করেন? তিন দশক ক্ষমতায় থেকে তাঁরা কি নিজেদের রাজ্যের জমিদার আর বাকি মানুষকে তাঁদের খাস তালুকের প্রজা ভাবেন?

কেউ কেউ বলছেন, সরকার যেভাবে জমির দখল নিয়েছে তা বেআইনি এবং অন্যায় ঠিকই, কিন্তু জমি ফেরত দিলেও তো সে জমিতে আর চাষ হবে না, অথবা কারখানা এতদূর এগিয়ে যাওয়ার পর তা কি বন্ধ হয়ে যাবে? এঁরা কি একবারও ভেবে দেখেছেন, এঁদের এই যুক্তিতে একজন খুনিও বলতে পারে, তাঁকে শাস্তি দিলেও যেহেতু খুন হওয়া ব্যক্তি বাঁচবে না, তাই শাস্তি দেওয়ার কোনও অর্থ নেই। বা কেউ জোর করে কারও বাড়ির দখল নিয়ে বলতে পারেন, ঝামেলা না বাড়িয়ে মালিকের উচিত ক্ষতিপূরণ নিয়ে তা মিটিয়ে ফেলা।

আসলে প্রথম থেকেই টাটা এবং সিপিএম সরকারের কার্যকলাপ মিথ্যা এবং প্রতারণায় ভরা। তারা শুধু সিঙ্গুরের চাষিদের সঙ্গেই প্রতারণা করেনি, গোটা রাজ্যের মানুষের সাথেই প্রতারণা করেছে। তাই টাটার সাথে চুক্তি নিয়ে এত ঢাক গুড়গুড়, এত গোপনীয়তা। টাটার সঙ্গে সরকারের কী চুক্তি হয়েছে, সেটা তারা জনসাধারণকে জানাতে চাইছে না। তাই টাটাকে দিয়ে কোর্টে মামলা করিয়েছে। যে সরকার ও শাসক দল চাষের জমি ও হাজার হাজার চাষির জীবন-জীবিকার স্বার্থ রক্ষার চেয়ে একজন ধনকুবের পুঁজিপতির মুনাফার স্বার্থকে বড় করে দেখে, তার বিরুদ্ধে চাষিদের যে কোনও আন্দোলনই ন্যায্য, ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক।

পুঁজিবাদ রাশিয়াকে কী দিয়েছে

বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং রাষ্ট্রসংঘের প্রকাশ করা তথ্য নিয়ে হাল আমলের পুঁজিবাদী রাশিয়ার অর্থনীতি, সমাজ, অপরাধজগৎ ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ভয়ঙ্কর ও মর্মান্তিক এক চিত্র প্রকাশিত হয়েছে 'নর্থস্টার কম্পাস' পত্রিকার জুলাই-আগস্ট '০৮ সংখ্যায়। তাতে দেখা যাচ্ছে,

- খুনের ঘটনায় রাশিয়া আজ বিশ্বে প্রথম। ২০০৫ সালে শুধু সরকারি খাতায় নথিভুক্ত হত্যার ঘটনা ৩০ হাজার ৮০০তে গিয়ে পৌঁছেছে। এছাড়া সেখানে প্রতি বছরই গড়ে ২০ হাজার মানুষ নিখোঁজ হয়ে যায়।
- আত্মহত্যায় রাশিয়া বিশ্বে দ্বিতীয়। এখানে প্রতি বছর ৫০ হাজারের বেশি মানুষ আত্মহত্যা করে।
- জেলবন্দি মানুষের সংখ্যার দিক দিয়ে রাশিয়া দ্বিতীয়। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক জেলবন্দি মানুষ আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ঠিক তার পরেই রাশিয়ার স্থান।
- সাংবাদিক হত্যার দিক দিয়ে রাশিয়া দ্বিতীয়। ইরাকের পর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সাংবাদিকের নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে এদেশে। ২০০৫ থেকে এ পর্যন্ত ১৪৭ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।
- মদ্যপানের বিচারে রাশিয়া বিশ্বে প্রথম ।
- গড় আয়ুর বিচারে রাশিয়া বিশ্বে ১৩৪তম স্থানে। এখানে মানুষের আয়ু গড়ে ৫৮ বছর।
- এইড্‌স প্রসারের দিক দিয়ে রাশিয়া বিশ্বে প্রথম স্থানে।
- ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং ডাকিনীবিদ্যা ও তন্ত্রমন্ত্র বিষয়ক সম্প্রদায়ের সংখ্যার দিক দিয়ে রাশিয়া বিশ্বে তৃতীয়। এখানে ৫০০-র কাছাকাছি এ ধরনের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় আছে। অর্থাৎ রাশিয়ার সমাজে কুসংস্কার আজ যথেষ্ট প্রভাবশালী।
- শিশুদের ধূমপানের দিক দিয়ে বিশ্বে রাশিয়া প্রথম।
- শিশু-পর্নোগ্রাফি ছড়িয়ে পড়ার দিক দিয়ে রাশিয়া বিশ্বে তৃতীয়। চূড়ান্ত দারিদ্রের কারণে এদেশেও শিশু বিক্রির ঘটনা অহরহ ঘটছে।
- যৌন নিপীড়নের শিকার শিশুর সংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে রাশিয়া দ্বিতীয়।

এই হল আজকের পুঁজিবাদী রাশিয়ার ভয়ঙ্কর চেহারা। সমাজতান্ত্রিক যুগে এই রাশিয়া যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন দেশের নাগরিকদের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো জীবনধারণ ও যাপনের মৌলিক বিষয়গুলি সুনিশ্চিত করা ছিল রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সে দায়িত্ব পালন করত। প্রতিবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে রাশিয়ায় আজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শোষণমূলক এই ব্যবস্থায় সেদেশের সাধারণ মানুষের জীবনে কী মর্মান্তিক দুরবস্থা নেমে এসেছে, এই তথ্যগুলি সেটাই তুলে ধরেছে। আবার এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই সেদেশের শোষক মালিকশ্রেণীর জীবন ভরিয়ে তুলেছে ঐশ্বর্যে। খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের রক্ত শোষণ করে তারা ভরিয়ে তুলছে তাদের ভাণ্ডার। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিয়মই হল তাই। একদিকে মেহনতি মানুষ নিঃস্ব রিক্ত হতে হতে সর্বস্বান্ত পথের ভিখারিতে পরিণত হয়, অন্যদিকে ধনিকশ্রেণীর ধনৈশ্বর্য ক্রমেই আকাশ ছুঁতে চায়। প্রকাশিত তথ্য থেকেও দেখা যাচ্ছে, আজকের রাশিয়া কোটিপতিদের সংখ্যাবৃদ্ধির দিক দিয়ে বিশ্বে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির পরেই তার স্থান। এদিকে পুঁজিবাদী রাশিয়ায় একজন মন্ত্রী সরকারি হিসাবে যা বেতন পান, তার পরিমাণ একজন সাধারণ শ্রমিকের চেয়ে ১০০ গুণ বেশি। এরপরে আছে সরকারি কোষাগারের টাকা লুঠের মতো 'অতি স্বাভাবিক' ঘটনা।

তাহলে সমাজতন্ত্র বর্জন করে রাশিয়ার মানুষ কী পেয়েছে? সমাজতন্ত্রের পতনে যারা উল্লসিত হয়েছিলেন তারা শুনছেন কি?

মহারাষ্ট্রের ইয়তমালে শিক্ষা বাঁচাও সম্মেলন

সর্বনাশা ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের সুপারিশ ও স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা বাতিলের দাবিতে ১৩ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের ইয়তমাল শহরের সাংস্কৃতিক ভবন হলে শিক্ষা বাঁচাও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেড় শতাধিক শিক্ষক, অধ্যাপক ও ছাত্র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা ও মহারাষ্ট্র সেভ এডুকেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কমরেড প্রমোদ কাম্বলে। প্রধান বক্তার ভাষণে সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দেবাশিস রায় বলেন — শিক্ষাকে গ্যাটস-এর অন্তর্ভুক্ত করে একে পুরোপুরি ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করার জন্য ন্যাশানাল নলেজ কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকর করতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি। এটি কার্যকর হলে শিক্ষা তার আসল উদ্দেশ্য ও প্রাণসত্তা হারিয়ে প্রহসনে পরিণত হবে এবং গরিব মানুষ শিক্ষার সুযোগ থেকে চিরতরে বঞ্চিত হবে। অপরদিকে সরকার সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলির নির্দেশে স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করার দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের নীতিনৈতিকতা, চরিত্র ও মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি এর বিরুদ্ধে 'সেভ এডুকেশন কমিটি'র নেতৃত্বে ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকদের ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। শিক্ষার বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক পুরুষোত্তম ঠোকর। এছাড়া বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সংগঠক শিক্ষক কমরেড সঞ্জয় বারী। সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক ডঃ শারদ করণায়ত স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা প্রচলনের তীব্র বিরোধিতা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিক্ষক কমরেড বিশ্বাস আলভোরে।

বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির নির্বাচনে এস ইউ সি আই-তৃণমূল প্রার্থী জয়ী

সোনারপুরের ঘাসিয়াড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির নির্বাচন ১৪ সেপ্টেম্বর প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। বিগত নির্বাচনগুলিতে সিপিএম ছাড়া বিরোধী কোনও দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু সমস্ত ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে এবারের নির্বাচনে এস ইউ সি আই-তৃণমূল জোট অংশ নেয়। তৃণমূলের ৪ জন এবং এস ইউ সি আই-এর দুইজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তৃণমূলের অশোক নস্কর এবং এস ইউ সি আই-এর ধীরেন সরদারকে ভোটে জয়ী করে অভিভাবকেরা গণআন্দোলনের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রছাত্রীদের উপর বর্বর আক্রমণ

২৮ আগষ্ট বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের বিএড-এর ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার ফল প্রকাশের দাবিতে উপাচার্যের নিকট ডেপুটেশন দিতে আসেন। পরীক্ষা শেষ হওয়ার প্রায় আড়াই মাস পরেও ফল প্রকাশ না হওয়ায় এবং ইতিমধ্যে এসএসসি পরীক্ষার ফর্ম জমা দেওয়ার দিন ঘোষিত হওয়ায় ফল প্রকাশের দাবিতে ছাত্ররা ডেপুটেশনের কর্মসূচি নিয়েছিলেন। এর আগেও তাঁরা উপাচার্যকে ফল প্রকাশের আবেদন জানিয়েছিলেন। উপাচার্য এদিন ডেপুটেশন না নিয়ে ছাত্রদের বিএড বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে পাঠালে তিনি তাঁদের ডেপুটি কন্ট্রোলারের কাছে পাঠান। ডেপুটি কন্ট্রোলার ফল কবে বেরোবে জানাতে অস্বীকার করেন। নিরুপায় ছাত্ররা আবার উপাচার্যের শরণাপন্ন হন। উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দরজার সামনে এলে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন ছাত্রছাত্রী গাড়ির সামনে বসে পড়ে তাঁদের সাথে কথা বলার অনুরোধ জানাতে থাকেন তাঁকে। এই পরিস্থিতিতে আচমকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিপিএম প্রভাবিত কর্মচারী ইউনিয়ন ও এসএফআই-এর একাংশ উপাচার্যের গাড়ি বের করে দেওয়ার অজুহাতে ছাত্রদের বর্বরভাবে কিল, চড়, লাথি, ঘুষি মারতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় হল, ছাত্রদের চোখের সামনে আক্রান্ত হতে দেখেও উপাচার্য নির্বিকার চিত্তে গাড়ি চড়ে বেরিয়ে যান।

মাটিতে ফেলে বেধড়ক পেটানোর ফলে আন্দোলনকারী ছাত্র অমিয় কুমার চ্যাটার্জী, দেবব্রত মাঝি, শুভপ্রিয় মাইতি, অলক শাসমল সহ দশজন গুরুতর আহত হয়। উপস্থিত চিত্রসাংবাদিকরা এই ঘটনা ক্যামেরাবন্দী করছে দেখে আক্রমণকারীরা তাদের উপরেও ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মারার হুমকি দেয়। তাঁদের ক্যামেরা কেড়ে নেওয়া হয়, ক্যাসেট বের করে ভেঙে দেওয়া হয়। চিত্র সাংবাদিক অরিন্দম গোপ, শুভব্রত গুহ, সুজিত শর্মা ও পার্থ মুখার্জীকে গুরুতর আহত অবস্থায় মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এর পর এসএফআই-এর সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা বিজয়োল্লাসে মিছিল করে।

এই বর্বরোচিত হামলা জনগণের মধ্যে প্রবল ঘৃণার সৃষ্টি করছে দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সংগঠন ভি ইউ এস কে ইউ এবং এসএফআই সংগ্রামী ছাত্র সংগঠন ডিএসও-র উপর দোষ চাপানোর ঘৃণ্য কৌশল নেয়। কিন্তু আক্রমণকারীদের ছবি পরদিন ২৯ আগস্ট দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় তাদের এই কৌশল ধরা পড়ে যায়।

ডি এস ও-র ওপর এস এফ আই এত ক্ষিপ্ত কারণ শিক্ষার বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, সেক্স এডুকেশন সহ সর্বনাশা শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে ডিএসও-ই হচ্ছে আজ প্রধান বাধা। অতীতে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়কে যখন কেবল একটি বৃত্তিমূলক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়তে চেয়েছিল রাজ্য সরকার, তখন বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত, শিক্ষাব্রতী পাঁচকড়ি দে ও সুশীলা মণ্ডলের মত প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে ছাত্রদের সংগঠিত করে ডিএসও সমগ্র শক্তি নিয়ে প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, যার ফলশ্রুতিতেই এই পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে নানা দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ডিএসও-র নেতৃত্বে আন্দোলন চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ও জেলা জুড়ে। কর্তৃপক্ষ আন্দোলনের চাপে ছাত্রদের বহু দাবি মানতে বাধ্য হয়েছেন। তাই আতঙ্কিত ও ক্ষিপ্ত এসএফআই ডিএসও-র নামে কুৎসা ছড়ায়; ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বছর বছর ডিএসও কর্মীদের রক্ত ঝরায়। তাদের এই ভূমিকার বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীরা আজ সোচ্চার।

৪৬ লক্ষ মানুষ জীবিকাচ্যুত হবে

পাঁচের পাতার পর

কিছু কর্মসংস্থানের সুযোগ দিচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা রয়েছে।'' কোথায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও হকার নেই শ্যামলবাবু? যেখানে মানুষের বসতি সেখানেই ক্ষুদ্র ব্যবসা গড়ে উঠেছে। আসলে নানা কথার ধানাই পানাই করে শ্যামলবাবুরা বৃহৎ পুঁজি প্রবেশের সুযোগই করে দিচ্ছেন। সিপিএমের পলিটব্যুরো বলেছে, 'ওয়ালমার্ট টেসকো, কেয়ারফরের মতো দৈত্যাকার বহুজাতিক সংস্থা পা বাড়ালে শুধু যে সংগঠিত খুচরো ব্যবসা তুঙ্গে উঠবে তাই নয়, এদের অনুপ্রবেশের ফলে সরকার ছোট ব্যবসায়ী বা কৃষকদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে যে উদ্যোগই নিক না কেন এরা তাতে অন্তর্ঘাত ঘটাবে'। তাহলে সিপিএমের বয়ানেই পরিষ্কার যে, বৃহৎ পুঁজিপতিদের উপর নিয়ন্ত্রণের যে কথা তারা বলছে বাস্তবে সেটার কোনও কার্যকারিতা থাকবে না। তা যদি হয় তাহলে নিয়ন্ত্রিত আকারে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের কথা বলা হচ্ছে কেন? একথা বলার অর্থই হল, বৃহৎ পুঁজিকে স্বাগত জানানো। সিপিএম এভাবে বৃহৎ পুঁজির দাসত্ব করছে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও হকারদের স্বার্থ একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের পায়ে জলাঞ্জলি দিচ্ছে।

সিপিএম সরকার এখানেই থামেনি। জার্মান বহুজাতিক মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি সংস্থাকে ই এম বাইপাসের ধারে বিপণন কেন্দ্র তৈরির জমি দিয়েছে। এই সংস্থাটি যাতে ব্যবসার লাইসেন্স পায় সেজন্য সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী কৃষিমন্ত্রী নরেন দে-কে অনুরোধ জানিয়েছেন। সিপিএম রিলায়েন্সকে শপিং মল খুলতে সমস্ত রকম আইনি ও অর্থনৈতিক সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। জমি কেনার ক্ষেত্রে, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ মকুব করে দিয়েছে। প্রথম পাঁচ বছর বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ ছাড় ঘোষণা করেছে। এছাড়া মার্কেট ফি, লাইসেন্স ফি, টোল ট্যাক্স মকুব করে দিয়েছে। এভাবেই সিপিএম খাল কেটে কুমির আনছে। ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সামনে, হকারদের সামনে সিপিএম খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ভাষণ দেয়, তা নিছক ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই নয়।

আমরা আগেই বলেছি, এই আক্রমণের বিরুদ্ধে হকাররা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা সোচ্চার হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এস ইউ সি আই কখনও এককভাবে কখনও তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যৌথভাবে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলছে। তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী ঘোষণা করেছেন, মুষ্টিমেয় বৃহৎ ব্যবসায়ী সব ব্যবসায় ঢুকবে আর বাকিরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এটা মেনে নেওয়া যায় না। এই অন্যায় ব্যবস্থা সচেতন মানবিকতাবোধ সম্পন্ন কোনও মানুষই মেনে নিতে পারেন না।

এই ভয়াবহ আক্রমণকে রুখতে হলে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে যুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে আন্দোলনের হাতিয়ার গণকমিটি। এই গণকমিটি গঠন করে আন্দোলন করেই নন্দীগ্রাম জয়ী হয়েছে, সিঙ্গুর লড়ে যাচ্ছে। গণকমিটিগুলিই তীব্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে খুচরো ব্যবসাকে বাঁচাতে পারে।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে পথ অবরোধ

কৃষক বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে জলপাইগুড়ি জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের কৃষকরা ১৬ সেপ্টেম্বর বারবিশাতে ৩১নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অবরোধ চলে। বক্তব্য রাখেন কমিটির সভাপতি শম্ভুনাথ সরকার, সম্পাদক ব্যোমকেশ বর্মন সহ যতীন্দ্রনাথ সরকার, বাবুল তালুকদার, সুশীল বিশ্বাস, মণীন্দ্র সরকার, গুণেন্দ্র বিশ্বাস, গোপাল সরকার, প্রহ্লাদ বিশ্বাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্যা সমাধানে আলোচনার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

সরকারি দামে ক্যাশমেমো সহ সার বিক্রিতে বাধ্য হলেন বৃহৎ সার ব্যবসায়ীরা

সরকারি ন্যায্য দামে সার বিক্রি ও কালোবাজারিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় বেশ কিছুদিন ধরে লাগাতার আন্দোলন চলছে। জেলার মুখ্য কৃষি-আধিকারিক থেকে শুরু করে মহকুমা কৃষিদপ্তর ও ব্লকগুলির এ ডি ও এবং বি ডি ও-গুলিতে বিক্ষোভ-ঘেরাও-অবরোধ-অবস্থান-ডেপুটেশন চলছে ধারাবাহিকভাবে।

এই আন্দোলনের চাপে গড়ে ওঠা তিনটি ভিজিল্যান্স টিমের তৎপরতায় ইতিমধ্যে জেলার প্রায় সর্বত্র সারের দাম কেজি প্রতি ২/৩ টাকা করে কমেছে। কিন্তু চাষিদের দাবি, শুধু দাম কমালেই চলবে না, সরকারি ন্যায্য দামে মেমো দিয়ে সার বিক্রি করতে হবে।

এই দাবি আদায় করার জন্য চাষিরা ২ ও ৮ সেপ্টেম্বর হাবড়া ব্লকের এ ডি ও-র দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। ব্লক কৃষি আধিকারিক হাবড়া শহরের সারের হোলসেলার ও স্টকিস্টদের তাঁর চেম্বারে বৈঠকে ডাকেন এবং তাদের সামনে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে চাষিদের দাবি তুলে ধরেন। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের চাপে জেলার অন্যতম বৃহৎ ডিস্ট্রিবিউটর চিত্ত দে-র গুদাম থেকে ২ সেপ্টেম্বর কয়েকশ' চাষি সরকারি দামে মেমোসহ সার কেনেন। একইরকম ভাবে ৮ সেপ্টেম্বর কয়েকশ' চাষি এ ডি ও অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়ে হাবড়া শহরের দু-জন ডিস্ট্রিবিউটরের দোকান থেকে মেমো সহ প্রায় পঞ্চাশ টন সার কেনেন। অর্থাৎ এক কথায় মেমো সহ সরকারি দামে সার বিক্রি করতে ডিস্ট্রিবিউটরদের বাধ্য করেন চাষিরা। এদিনের এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন ব্লক এ আই কে কে এম এস-এর পক্ষে সম্পাদক কমরেড উৎপল সিনহা ও কমরেডকানাই ঘোষ। বিক্ষোভ আন্দোলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড দাউদ গাজি ও সভাপতি কমরেড গোপাল বিশ্বাস। নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই আন্দোলন চলতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত জেলার সর্বত্র খুচরা দোকানগুলোতে রেট-বোর্ড টাঙিয়ে সার বিক্রি চালু না হচ্ছে। শুধু উত্তর ২৪ পরগণা জেলাতেই নয়, রাজ্যের সর্বত্র এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেবার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

যদি কর্মসংস্থানই লক্ষ্য হয় তাহলে রাজ্য সরকার আড়াই লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগ করছে না কেন?

রাজ্যের সিপিএম সরকার কর্মসংস্থানের ঢাক পেটালেও এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষার কথা বারবার প্রচার করলেও রাজ্য সরকারি ক্ষেত্রে ২.৫ লক্ষাধিক শূন্যপদে লোক নিয়োগ করছে না। কর্মরত হাজার হাজার অনিয়মিত কর্মীকে মাসে মাত্র ৫০ বা ১৭৫ টাকা বেতনে কাজ করানো হচ্ছে। এই অভিযোগ কর্মচারী সংগঠন জেপিএ-র। ১৯ সেপ্টেম্বর এসপ্ল্যানেড মেট্রো চ্যানেলে এক শ্রমিক সমাবেশে জেপিএ নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজ্যে কমিউনিটি হেল্‌থ গাইড এবং ট্রেন্ড দাইদের মাসিক মাত্র ৫০ টাকা বেতনে কাজ করানো হচ্ছে। ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপারদের আজও বেশিরভাগ অফিসে মাসিক মাত্র ১৭৫ টাকায় কাজ করানো হচ্ছে।

রাজ্য সরকার যেভাবে কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি উপেক্ষা করছে এবং মহাকরণে আন্দোলনকারী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে হয়রানি করছে সমাবেশ থেকে তার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়ে জেপিএ নেতৃবৃন্দ বলেছেন, নির্ধারিত সময়ের ৬৭ মাস পরে ৫ম বেতন কমিশন ঘোষণা বাস্তবে অপ্রাসঙ্গিক। তাঁরা এই বেতন কমিশনের প্রহসন বন্ধ করে অবিলম্বে 'ডিয়ারনেস পে'কে 'বেসিক পে'র সঙ্গে যুক্ত করে ১.১.০৬ থেকে নতুন বেতন কাঠামো চালুর জন্য জেপিএ সহ অন্যান্য কর্মচারী সংগঠনগুলির সাথে আলোচনার দাবি জানান।

সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি অচিন্ত্য সিনহা বলেন, তাঁদের আন্দোলনের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। যেমন (১) ১.১.০৬ থেকে নয়া বেতন কাঠামো চালু হয়েছে, (২) বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে ডিপি বা মহার্ঘ বেতনকে মূল বেতনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, (৩) গেজেটেড ছুটির সংখ্যা কমানো হয়নি, (৪) বোনাসের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়নি, (৫) বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট বেড়েছে, (৬) মেডিকেল ইনসিওরেন্স বাতিল হয়েছে, যার ফলে সি জি এইচ এস প্রকল্প রক্ষা পেয়েছে।

তিনি বলেন, শ্রমজীবী জনগণের ওপর বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর নতুন নতুন আক্রমণ নেমে এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকার আরও কিছু বিপজ্জনক পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন (১) চতুর্থ শ্রেণী বা গ্রুপ ডি পদ তুলে দেওয়া, (২) স্থায়ী কাজে ব্যাপক আউটসোর্সিং, ঠিকাদারীকরণ, (৩) কর্মচারীদের ন্যায্য বেতন থেকে টাকা কেটে নিয়ে চালু নতুন পেনশন স্কীম বহাল রাখা, (৪) পুরনো পেনশন স্কীম পরিবর্তন করা, (৫) রেলসহ বিভিন্ন বিভাগের কোম্পানিকরণ প্রভৃতি। শ্রমিকস্বার্থবিরোধী এইসব পদক্ষেপ বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য জেপিএ নেতৃবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানান।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সভাপতি মুরসেদ আলি। বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি বিমল জানা, শৈবাল চক্রবর্তী, (ন্যাশনাল লাইব্রেরী), এস পি ওঝা (সিপিডব্লুডি), অনিন্দ্য রায়চৌধুরী (পঞ্চায়েত), সহদেব মণ্ডল (সার্ভে অব ইন্ডিয়া), তড়িৎ অধিকারী (সিডিএল), নুরুল আলম (পোস্টাল ইউনিট), গোপাল কর (ট্রাম ওয়েজ), মানব দাশগুপ্ত (সিএফডিএ), মাধবী পণ্ডিত (অঙ্গনওয়াড়ি), মনোরঞ্জন গাঙ্গুলি, মধু বেরা, আব্দুস সালাম প্রমুখ কর্মচারী নেতৃবৃন্দ। ৫ জনের প্রতিনিধি দল বিমল জানার নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন।

১৯ সেপ্টেম্বর এসপ্ল্যানেড মেট্রো চ্যানেলের শ্রমিক সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন জেপিএ-র সর্বভারতীয় সভাপতি অচিন্ত্য সিনহা

সারের কালোবাজারি
হুগলিতে কৃষক বিক্ষোভ

অবিলম্বে সারের কালোবাজারি বন্ধ, সরকার নির্ধারিত দামে সার বিক্রি, সারের মূল্যতালিকা টাঙানো, বেশি দামে বিক্রি করলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, আলুচাষিদের ঋণমকুব এবং সহজ শর্তে ঋণদান প্রভৃতি দাবিতে সারা বাংলা আলুচাষী সংগ্রাম কমিটি ৯-২৫ সেপ্টেম্বর একপক্ষকালব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে হুগলি জেলার দাদপুর পোলবা ব্লক কৃষি উন্নয়ন অফিসে ১১ সেপ্টেম্বর ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন হুগলি জেলা কমিটির পক্ষে দেবু চক্রবর্তী, দীপক সিংহ এবং থানা কমিটির পক্ষে গদাধর পাল, সেখ সাহাবুদ্দিন, মহিকুল ইসলাম প্রমুখ। ১৮ সেপ্টেম্বর হরিপাল ব্লকেও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এখানে নেতৃত্ব দেন নেপাল সাহা, বিশ্বনাথ ঘোষ, সেখ নাসিরুদ্দিন প্রমুখ। সংগ্রাম কমিটি একই দাবিতে ২৫ সেপ্টেম্বর মুখ্যকৃষি আধিকারিক এবং জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ ডেপুটেশনের কর্মসূচি নিয়েছে।

মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধায় ছাত্রসভা

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের সর্বনাশা সুপারিশের প্রতিবাদে মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা শহরে ১৪ সেপ্টেম্বর একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ আই ডি এস ও'র প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কমরেড দেবাশিস রায় ও পার্টি সংগঠক কমরেড প্রমোদ কাম্বলে। বক্তারা ন্যাশনাল নলেজ কমিশনের সর্বনাশা সুপারিশের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-কে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এই সভা থেকে প্রবীণ কাড়ুকে সভাপতি ও আশীষ গোমেসকে সম্পাদক করে ৬ জনের ডি এস ও ওয়ার্ধা জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন ওয়ার্ধার শিক্ষক নেতা কমরেড অতুল উদ্‌দে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in